Oikhane Jeo Nako Tumi by Pranob Bhatta

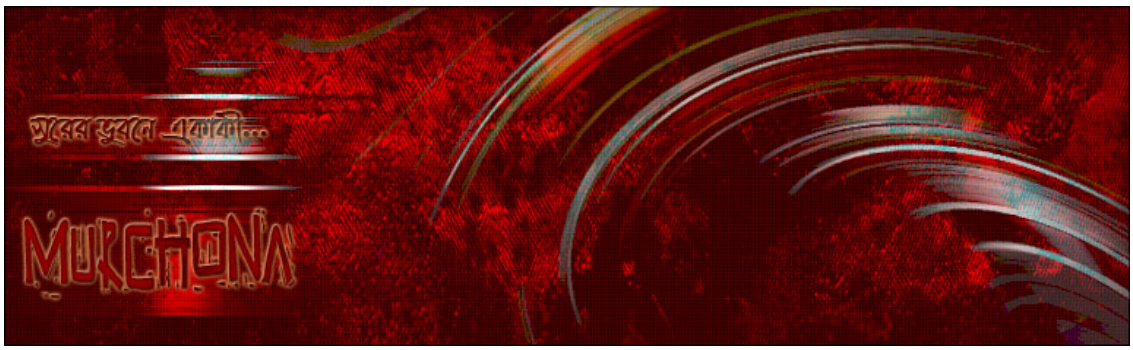

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি

প্রণব ভট্ট

অভিনয়ে খুবই ভালো,
নাচেও অসাধারণ,
তবে গান যে গায় অনেক অনেক ভালো, সে কি জানে ?

মেহের আফরোজ শাওন

তখন বয়স কমই হবে, ঠিক ঠিক মনে নেই তার, ৭ কি ৮ হবে বোধহয়; সে সময় কোনো কোনো মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত বাবুর। ঘুম ভেঙে যেত গানের শব্দে। ওটাকে গান বলা উচিত হবে কি না, অবশ্য তার সন্দেহ আছে। তবে হ্যাঁ, বলা যেতেও পারে। গুনগুন শব্দেও কি গান হয় না ? তার মা বারান্দায় বসে গভীর রাতে গুনগুন করে গান গাইতেন।

ভয় ভয় করত বাবুর, সে পাশ ফিরত। পাশে মা থাকার কথা। সে আর মা এক বিছানায় ঘুমায়। কিন্তু পাশে মা নেই। থাকবেন কী করে! তার ঘুমের ভেতর মা কখন বারান্দায় গিয়ে বসেছেন, সে কি জানে ? কিন্তু তার মনে হতো, বারান্দায় যে মহিলা বসে আছেন, বারান্দায় যে মহিলা গান গাইছেন, সে মহিলা তার মা নন, তাকে সে চেনে না। তার ভয় বেড়ে যেত। সে মৃদু গলায় ডাকত, 'মা।'

কোনো উত্তর আসত না।

সে আরেকটু গলা তুলত, 'মা।'

বারান্দা থেকে গানের শব্দ ভেসে আসত— 'ওগো আমার শ্যামল কন্যা, স্নানে যাইবা তুমি, ঘাটেতে বসিয়া আমি...'।

বাবুর কান্না পেত। দু চোখ মুছে নিত সে। গলা উঁচু করে ডাকত, 'মা।'

কিন্তু তার ডাক শোনার সময় তখন কোথায় মার, মার গলায় তখন 'নদী বইয়া যায়, রুপালি নদী আমার বইয়া যায়...'।

এভাবে চলতে চলতে কোনো এক সময় আবারও ঘুমিয়ে পড়ত বাবু। তারপর মা কী করতেন তা সে টেরও পেত না। সকালে উঠে দেখত মা হয় ঘর গোছাচ্ছেন, কিংবা রান্নাঘরে নাশতা তৈরিতে ব্যস্ত। তাকে দেখে বলতেন, 'কী রে, এত বেলা কইরা উঠস ক্যান ? বেলা কইরা উঠন ভালো না। ইশকুলের সময়ও যাইতাছে গা।'

আবার কোনো রাতে এমন, সে জেগে থাকত আর মা বারান্দা থেকে এসে দাঁড়াতেন তার কাছে, শিয়রের পাশে। বাবু ঘুমিয়ে থাকার ভান করত। কিন্তু ওই বয়সে ভানটা সে বুঝি ঠিকমতো করতে পারত না। কিংবা ভান ধরে ফেলার অদ্ভুত কোনো ক্ষমতা ছিল মার। মা অবাক গলায় বলতেন, 'বাজান, এইটা কী ব্যাপার!'

www.Murchona.com suman_ahm@yahoo.com

বাবু চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত, যেন সত্যি সে ঘুমাচ্ছে।

'আহা বাবু, তুই যে জাইগা আছস, এইটা আমি জানি।'

'তুমি কই গেছিলা ?'

'বারান্দায় গেছিলাম বাজান।'

'কী করতেছিলা ?'

'গান গাইতেছিলাম। শুনস নাই ?'

'এত রাইতে তুমি ক্যান গান গাও মা ?'

'এইটা আবার কী কথা! গানের আবার রাইত-বিরাইত কী!' বলেই মা আবারও হয়তো মনের আনন্দে উঁচু গলায় গান গেয়ে উঠতেন, 'আমায় এত রাতে কেনে ডাক দিলি...।'

'মা।' বাবুর অবস্থা হয়তো তখন ভয়ে ফুঁপিয়ে ওঠার মতো।

'কী বাজান ?'

'ডর লাগে মা। এত রাইতে...!'

'ডরের কী হইল ? ডরের কিছু নাই রে বাজান। হুন, ডরাইলেই ডর, না ডরাইলে ডর নাই।'

'তবুও ডর লাগে মা।'

'ঘুমা। কাইল ইশকুল নাই ?' মা মৃদু ধমকে দিতেন, 'ঘুমা কইলাম।'

স্কুলে একেবারেই মন বসত না বাবুর। লেখাপড়ায় আপত্তি না থাকলেও আপত্তি কিন্তু একটা ব্যাপারে ছিল তার, আপত্তি ছিল স্কুলে যাওয়ায় এবং আসায়। অতক্ষণ ধরে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে তার ইচ্ছে করত না। তার মনে হতো, এর চে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ঢের বেশি আনন্দের। এক পথ থেকে আরেক পথে, সেই পথ থেকে আবার অন্য পথে— এটাই ছিল তার কাছে প্রিয়। কখনো কখনো এমন করতও সে। আরেকটু যখন বড় হয়েছে, স্কুলের নাম করে বেরিয়ে স্কুলে যেত না। বই-খাতা রাখার জায়গা পেলে ভালো, নইলে বই-খাতা হাতে করেই এদিক-ওদিক ঘুরত। পথে পথে, ঝোপঝাড়ে আর নদীর ধারে। তাদের মফস্বল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নাম ছিল সুন্দরী। সুন্দরী নদী কিন্তু দেখতে একটুও সুন্দর ছিল না। হতশ্রী অবস্থা, যাকে বলে প্রায় মরে যাওয়া। কিন্তু সেই মরা নদী বাবুকে ভীষণ টানত। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। একবার নদীর পাশে এক ঝোপের ভেতর সে একটা পাখির বাচ্চা পেয়েছিল। খুবই দুর্বল, মর-মর অবস্থা, কে জানে কীভাবে বাচ্চাটা এখানে এসে পড়েছে; বাঁচার আশা নেই ভেবে মা'ই তাকে ফেলে চলে গেছে, নাকি বাচ্চাটা নিজে নিজেই এখানে এসে পড়েছে, কে বলবে! বাচ্চাটাকে

পরম মমতায় বাসায় নিয়ে এসেছিল বাবু। তারপর তাকে বাঁচিয়ে রাখার কী আপ্রাণ চেষ্টা তার! কিন্তু পাখির বাচ্চা সুস্থ হয় না, তা দেখে বাবুর মুখ ক্রমশ কালো আর চোখ দুটো ছলছল হয়ে যায়। মা তার অবস্থা দেখে হাসেন, 'কী হইছে রে বাজান?'

'এইটা ভালো হয় না ক্যান মা? এরে আমি এত যত্ন করি...।'

'শুধু যত্নে কাম হয় না রে বাজান।'

'তাইলে কী করুম?'

'কিছুই করনের নাই। এই পাখি বাঁচনের হইলে বাঁচব, মরনের হইলে মরব। তুই এর কী করবি?'

'আমি এরে যে কইরাই হোক বাঁচাইতে চাই মা।'

'আরে বোকা, এর যদি কপালে মরণ লেখা থাকে, এরে ক্যামনে বাঁচাইবি তুই?'

মার সব কথা বুঝত না বাবু, সে বয়সে বোঝার কথাও না তার। তবে তার মনে আছে, মার অনেক কথা সব সময় ফলে যেত। যেমন পাখিটা বাঁচেনি। মরে গেছে। এটা অবশ্য কোনো যুতসই উদাহরণ না। একটা রোগগ্রস্ত বা আহত পাখির বাচ্চা মারা যেতেই পারে। কিন্তু মার বেশ কিছু কথা ফলে যেত বলে অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও মা'র বলা কথার মিল অনেকেই বের করে ফেলত। অবশ্য অনেকে বলতে কজনই আর, কজনের সঙ্গেই বা তাদের সম্পর্ক, ওঠা-বসা, যাওয়া-আসা ছিল!

স্কুলে যেতে তার কখনোই ভালো লাগত না। সে যে স্কুল ফাঁকি দেয়, এটা জানাজানি হয়ে যেতে সময় লাগে না এবং তার বাবাও সে জন্যে একদিন স্কুলে গিয়ে মাস্টারদের বলে আসেন তার ওপর কড়া নজর রাখতে। আর মাস্টাররাও সেই দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে শুরু করেন। কিন্তু ক্লাসে কিছুতেই মন বসে না বাবুর। মাস্টার পড়ান, আর সে ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে। খায়রুল মাস্টার, যার মুখ জুড়ে অসংখ্য দাগ, মুখ দেখে মনে হয় মুখ না, যেন খেজুরগাছ! একদিন পড়া থামিয়ে গর্জে উঠলেন, 'এই বদমাশ, এই, ওঠ, ওঠ তুই।'

বাবু উঠে দাঁড়ায়।

'কী দেখস?'

কী দেখার কথা বলবে বাবু? সে বাইরে রোদ দেখছে, রোদের ভেতর ছায়া দেখছে, আকাশের যতদূর দেখা যায় দেখছে, আর দেখছে আকাশের সেই অংশ জুড়ে পাখিদের আনাগোনা। এসবের কথা বলবে সে খায়রুল স্যারকে?

'কী রে, চুপ কইরা আছস ক্যান! কী দেখস তুই বাইরে?'

আচ্ছা, এই যে সে ওসব দেখার কথা বলবে বলে ভাবছে, খায়রুল স্যার বুঝবেন? তার বয়স কম, তবু তার মন বলে, তার সন্দেহ হয় স্যার বুঝবেন না। বাবু তাই নিরুত্তর থাকে।

'বেয়াদব কত বড়!' খায়রুল স্যার আবারও গর্জে ওঠেন, 'অই, অই, আমি পড়াই আর আমার পড়া তোর কানে যায় না ? কী পড়াইছি আমি ক।'

সে তো বলতেই পারে বাবু। কিন্তু তার বলতে ইচ্ছে করে না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, মাথা নিচু করে রাখে। কারণ, তার ভয় হয়। খেজুরগাছের বাইরেটা কর্কশ হলেও ভেতরে থাকে রসের ধারা, খায়রুল স্যার সে রকম না, তার বাইরে-ভেতরে কোথাও রস নেই।

'ক। চুপ করে থাকবি না। এতক্ষণ ধইরা কী পড়াইছি ক।'

বাবু বলতে আরম্ভ করে। প্রথমে সে মাথা তোলে না, মাথা নিচু করে বলতে আরম্ভ করে। তা দেখে খায়রুল স্যার খেঁকিয়ে ওঠেন, 'অই, মাথা তুইলা ক। আমার দিকে তাকাইয়া ক।'

স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে যায় বাবু, আর সে দেখে স্যারের বীভৎস মুখ ক্রমশ আরও বীভৎস হয়ে যাচ্ছে। এর কী কারণ, বাবু বুঝতে পারে। যদি এমন হতো, স্যার এতক্ষণ কী পড়িয়েছেন, তার কিছুই সে বলতে পারছে না, তাহলে এক কথা ছিল। কিন্তু সে ঠিক ঠিক জানে, স্যার এতক্ষণ যা পড়িয়েছেন তা সে হুবহু বলে দিয়েছে। এই ক্ষমতা আছে তার। সে আকাশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্যারের পড়ানোও অনুসরণ করে মনে রাখতে পারে। এখন সেই শোনা কথাই সে গুছিয়ে বলে দিয়েছে। কিন্তু স্যার তাতে এত খেপে গেলেন কেন ? সে বলা শেষ করে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

খায়রুল স্যারকে ভয়াবহ দেখায়, যেন এইমাত্র কেউ তাকে প্রচণ্ড অপমান করেছে, যেন এইমাত্র কেউ তার সব অহঙ্কার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। হাত দিয়ে তিনি বাবুকে ডাকেন, 'আয়, এদিকে আয় তুই।'

বাবুকে যেতে হয় তার কাছে, 'বিদ্যা ফলাস, অ্যাঁ, আমি যখন পড়াই তখন তুই বাইরে তাকায়া থাকস আর এখন বিদ্যা ফলাস! বিদ্বান হইছস!' খায়রুল স্যার তার চুল মুঠো করে ধরে ঝাঁকাতে আরম্ভ করেন, 'আর একবার জানালা দিয়া বাইরে তাকাইছস তো...।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকানো বন্ধ হয়ে গেল। কেন এমন হয়, বাবু বুঝতে পারে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে কী এমন অসুবিধা ? এমন নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে বলে সে পড়া বুঝতে পারছে না, বলতে পারছে না। কিন্তু এ কথা সে কাকে বলবে! এই যে খায়রুল স্যারের ব্যবহারে তার চোখভরা জল, এই অপমান আর লজ্জা, এই কষ্টের কথা কাকে বলে সে! বলা অবশ্য যায়, একজনকেই বলা যায়। মুন্নীকে সে তো কত কী-ই বলে, বলে ফেলে, না-বলে পারে না; সেই মুন্নীকে বলা যায়। কিন্তু বলি বলি করেও তার কখনোই খায়রুল স্যারের অর্থহীন অত্যাচারের কথা মুন্নীকে বলা হয়ে ওঠেনি।

শিক্ষকদের মধ্যে তাকে পছন্দ করতেন মাত্র একজন, জালাল মাস্টার। জালাল মাস্টারের বয়স অনেক। সেই চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টানা মাস্টারি করে আসছেন। এক জীবনে এই একটাই কাজ, শিক্ষকতা। জীবনে কখনো আর কিছুই করেননি তিনি। শহরের সব লোক তাকে এক নামে চেনে, আর ডাকেও ওই 'জালাল মাস্টার' বলে। সেই জালাল মাস্টারেরও তারই মতো নদী খুব পছন্দ ছিল। কোনো কোনো বিকেলে, ক্লাস শেষে জালাল মাস্টারের সঙ্গে অবশ্য বাবুর নদীর ধারে দেখা হয়ে যেত।

'বাবু না ?'

'জি স্যার।'

'কী করস ?'

'কিছু না স্যার।'

'নদী দেখস ?'

'জি স্যার।'

'আমিও নদী দেখি। এখন কী অবস্থা...! অথচ আমাগো ছোটবেলায়... বাবু...।'

'জি স্যার।'

'তুই যখন বড় হবি, নদীর এই চেহারাও আর দেখবি না।' জালাল মাস্টার বলতে বলতে হাসেন, 'ছোটবেলায় আমি দেখেছি ভরা নদী, এখন তুই দেখস মজা নদী, বড় হয়ে হয়তো দেখবি বুঝি মইরাই গেছে নদীটা।'

'স্যার, নদী মইরা যায় ?'

'সবকিছুই মইরা যায়...। সবকিছু।'

অকৃতদার জালাল মাস্টারের ছিল বিচিত্র স্বভাব। তার শেখানোর বিষয় ছিল অঙ্ক। আশপাশে বহুদূর পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রবিশারদ হিসেবে তার খ্যাতি ছিল খুবই। তবে পাগলাটে হিসেবেও পরিচিতি ছিল তার। ক্লাসে মাঝেমধ্যে তার প্রমাণও মিলত। অঙ্কের টিচার, করাবেন অঙ্ক, ক্লাসে এসে কোনো দিন হয়তো বলে বসতেন, 'আজ তোমাদের বাংলা রচনা লিখতে দেব।'

কেন ? আরে, অঙ্কের ক্লাসে বাংলা রচনা কেন! কিংবা কেন কোনো দিন ইংরেজি ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ম্‌স কিংবা কোনো দিন পেন্সিলে ছবি আঁকা ?

এই প্রশ্ন করার সাহস কারো ছিল না। হেডমাস্টার অসীম কুমার রায় পড়াতেন ইংরেজি। তিনি জালাল মাস্টারকে পছন্দ করতেন খুব, ভালোও বাসতেন। স্যারের বিষয়ে তিনি নিজের ক্লাস নেয়ার সময় কখনো কখনো হেসে জিজ্ঞেস করতেন, 'এই, জালাল স্যারের ক্লাসে কেমন মজা পেলি তোরা ?'

আর কারো কথা বলতে পারবে না বাবু, তবে সে মজা পেত। অঙ্ক না করে লেখো বাংলা রচনা, কিংবা আঁকো ছবি। চমৎকার না ?

অঙ্কের শিক্ষক জালাল মাস্টার একদিন ক্লাসে বাংলা রচনা লিখতে দেন, বিষয় 'আমি যখন বড় হব'। সময় বরাদ্দ আধঘণ্টা, শব্দসংখ্যা ৬০০।

লিখতে তাদের সবারই কষ্ট হয়, বাবুরও। বড় হয়ে কী হবে, কী করবে, বড় হলে কী রকম হয়— এসব বড় এলোমেলো ব্যাপার। কিন্তু জালাল মাস্টারের ইচ্ছে যখন, লিখতে হবে। সুতরাং লেখে সবাই, কিন্তু জালাল মাস্টার উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন শুধু বাবুর লেখা নিয়ে, 'এই ছেলে ক, মিথ্যা কইবি না, সত্যি তুই এসব ভাবস ?'

জালাল মাস্টারের তাকানোর মধ্যেই প্রশংসা, বাবু এত লজ্জা পেয়ে যায়, সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না।

'ভারী মজা তো রে! এত এত স্বপ্ন তোর ভিতর!'

বাবু লাজুক হেসে চুপ থাকে।

'কিন্তু এত স্বপ্ন তুই বাঁধবি কী করে ?'

জালাল মাস্টারের এই কথার অর্থ তখন বাবু বোঝেনি। তারপর বহুদিন গেছে, এই কথার অর্থ বাবু বোঝেনি। কিংবা এমনও হতে পারে, কোনো দিনই সে বোঝেনি, কিন্তু বাক্যটা থেকে গেছে। শৈশবে মাত্র একবার শোনা 'এত স্বপ্ন তুই বাঁধবি কী করে' আজীবন তার মনের কোনো এক গহিন কোণে থেকে গেছে।

আরেকবার ওই জালাল মাস্টারের পাগলামোয় বা ইচ্ছেয়, তা সে যা-ই হোক না কেন, তারা সবাই ক্লাসে বসে পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকল। আর সেবার বাবুর আঁকা ছবি দেখতে দেখতে স্যার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, 'কী রে, তুই আমাগো সুন্দরী নদী আঁকছস!'

স্যারের উচ্ছ্বাস দেখে বাবু এবারও লজ্জায় পড়ে যায়, 'জি স্যার, সুন্দরী নদী।'

'তুই আঁকছস আমাগো যৌবনকালের সুন্দরী নদীর ছবি। নদী যখন ভরা ছিল। ভরা সুন্দরী নদী তুই দেখছস ?'

'না স্যার, দেখি নাই।'

'তাও আঁকলি।... আর এই যে আকাশে এত এত মেঘ...। বাহ্, চমৎকার!'

বাবু লজ্জা পায়, এত লজ্জা পায় যে চোখ তুলেই আর তাকাতে পারে না।

জালাল মাস্টার তাকে দোয়া করেন, বলেন, 'তুই একদিন অনেক বড় হবি বাবু।'

'জি স্যার।'

'আমারও বড় হওয়নের ইচ্ছা আছিল। কিন্তু এই ছোট জায়গা আমারে আটকাইয়া রাখল। তোকে পারব না। অনেক বড় হবি তুই। হ, তুই তোর নামের রোশনাই করবি, এই আমি কয়া দিলাম।'

সে যে বড় হবে, বড় কিছু বা বড় কেউ, এটা বাবা কখনো বিশ্বাস করতেন না। বাবার চাকরি ছিল সেল্‌সম্যানের। তাদের শহরে ছিল বিভিন্ন পণ্যের এক ডিলারের অফিস। বাবার চাকরি সে অফিসে। কাজ— পণ্যের স্যাম্পল নিয়ে আশপাশের শহরে ঘুরে বেড়ানো, অর্ডার সংগ্রহ করা, মূল অফিসে অর্ডার পাঠিয়ে পণ্য সংগ্রহ করা, অর্ডারমাফিক বিভিন্ন দোকানে বিতরণ করা এবং পয়সা তোলা। কাজটা ছিল কষ্টের। কাজটা তাকে মাসের বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে রাখত। এ কারণেই কিনা কিংবা অন্য কোনো কারণে কে জানে, বাবা যখনই বাসায় ফিরতেন, তার মেজাজ থাকত তিরিক্ষি।

তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, এ ছিল বাবার শখ। তবে তার সঙ্গে সুবিধা করতে পারলেও মার সঙ্গে তেমন সুবিধা করা ছিল কঠিন। কোনো কোনো দিনের কথা মনে আছে বাবুর, এসব দিনের কথা সে কোনো দিন ভুলবে না। একদিন কী হলো— বলা নেই কওয়া নেই বাসায় ফিরেই বাবা তাকে চড় মেরে বসলেন।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। বাবু বারান্দায় মার্বেল খেলছিল। মার্বেল গড়িয়ে গড়িয়ে বারান্দা থেকে নিচে পড়ে গেলে সে সেটা কুড়াতে ছোটে, অনেক খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই সে দেখে, বাড়ির গেটের ওপাশে বাবা। বাবার সঙ্গে তার আসলে কোনো সুখকর স্মৃতি নেই, বাবা কখনো তার কিংবা সে কখনোই বাবার কাছের মানুষ নয়। তবু বাবাকে দেখে তার মুখ হাসিতে ভরে যায়, 'বাবা ফিরছ?'

তার এই উচ্ছ্বাসের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না বাবা, গেট খুলে ভেতরে ঢুকে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী করস?'

'মার্বেল খেলি বাবা।'

'খেলা ছাড়া আর কিছু বোঝস না?' বাবা দেরি করলেন না, শব্দ করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন।

বাবুর কান্না আসে ঠিকই, কিন্তু কাঁদে না সে।

মা এসে দরজায় দাঁড়ান, 'কী করো?'

'এই বদমাইশরে একটু টাইট দেওনের চেষ্টা করতাছি।'

'ছাড়ো।'

'টাইট দিয়া লই।'

'টাইট দিবা ক্যান! কী করছে ও?'

'কিছু করে নাই। আমার ইচ্ছা করতাছে।'

'বাড়াবাড়ি করবা না, বাবুরে ছাড়ো কইতাছি।'

'খুব দেখি মায়া, অ্যাঁ, পোলার জন্য খুব দেখি মায়া!' বাবা চোখ তুলে মার দিকে তাকান, মুখে সামান্য হাসি খেলা করে তার, 'ওরে টাইট দিমু, দেখি তুমি কী করো!'

বাবুর মা তখনই কিছু করতেন না, করতেন পরে। মার খেয়ে কেঁদে একাকার হয়ে আবার যখন ভুলেও গেছে বাবু ব্যাপারটা, ভুলে গেছে মানে ব্যাপারটা যখন তাকে আর নাড়াচ্ছে না, মা এসে দাঁড়াতেন তার কাছে, 'বাবু, আয় তো আমার লগে।'

মার চেহারা স্বাভাবিক, কথা বলার ধরনও স্বাভাবিক, শুধু এক হাতে একটা বঁটি অন্য হাতে শিল-পাটার শিল।

প্রথমবার যখন এমন ঘটেছিল, মার স্বাভাবিক চেহারা আর বলার ধরন দেখে, হাতে ওই বঁটি আর শিলের কারণে ঘাবড়ে গিয়েছিল বাবু, 'কই যামু?'

'আয়। আইলেই দেখতে পারবি।'

বাবা তখন বারান্দায় ইজি চেয়ারে শরীর এলিয়ে। মা গিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলেন, 'একটা জিনিস দেইখা দাও তো।'

বঁটি আর শিল হাতে মাকে দেখে বাবার তখন ভ্যাবাচেকা অবস্থা, 'কী হইছে?'

'কিছু হয় নাই।'

'কী, কও।'

'বঁটির ধার একটু দেইখা দাও তো।'

'ক্যান! কী হইছে!' বাবা কিছুটা বিস্ময় আর কিছুটা ভীতি নিয়ে মার দিকে তাকান, 'তুমি দেখো।'

'দেখছি। ধার আছে কি নাই, বুঝি না। তুমি দেইখা দাও।'

বাবা গম্ভীর মুখে ধার পরীক্ষা করেন, 'হ, ধার আছে।'

'না, নাই।' মা গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করে জানান, 'এক কোপে এই ধারে আমি কারো গলা কাটতে পারুম না, আমার গায়ে অত শক্তি নাই।'

'কোপ দিবা! গলা কাটবা!' বাবার গলায় অপরিসীম বিস্ময়, ভয়, 'আরে, কারে কোপ দিবা! কার গলা কাটবা তুমি!'

মা উত্তর না দিয়ে বারান্দার এক কোণে বসে পড়েন এবং শিল রেখে তার ওপর বঁটি ঘষতে আরম্ভ করেন। ঘষেন আর মাঝেমধ্যে ধার পরীক্ষা করে দেখেন। দেখে একসময় সন্তুষ্ট হন, মুখে হাসি ফোটে এবং তৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকান, 'হ্যাঁ, এইবার হইছে।' এই বলে মা উঠে আসেন বাবার পাশে, 'এইবার ধার পরীক্ষা কইরা দেখো।'

বাবা ধার পরীক্ষা করেন, মাথা ঝাঁকান এমন ভঙ্গিতে যে ধার সত্যি হয়েছে। দেখে মা খিলখিল করে হেসে ওঠেন, 'এইবার অনেক ধার হইছে, না?'

'হইছে।'

'এইবার শুধু গলায় বসায়া এক টান দিলেই হইব। হইব না?'

'হইব।'

'এখন কও, কও দেহি বাবুর গায়ে আর হাত দিবা কি না ?'

বাবা কিছুক্ষণ মার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর বলেন, 'পোলায় বদমাইশ হইছে। ইশকুল নাই, পড়াশোনা নাই...।'

'বাবুর গায়ে আর হাত দিবানি, কও ?'

'হাত কই দেই!... ওর ভালোর জন্যেই শাসন করি।'

'বাবুর গায়ে হাত দিবা ? বঁটির ধার তো দেখছই।'

'বঁটি রাইখা আসো, তারপর কথা কই।'

'ক্যান! বঁটি হাতে আমারে দেখলে ডর করে ?'

'বঁটি রাইখা আসো, কইতেছি তো।'

মা রান্নাঘরে বঁটি রেখে বারান্দায় ফিরে আসেন, 'কও শুনি।'

'তুমি দুশ্চরিত্রা।'

'এইটা তো তুমি জাইনা-শুইনাই বিয়া করছিলা। করো নাই ?'

বাবা চুপ থাকেন।

'জাইনা-শুইনাও ক্যান বিয়া করছিলা ?'

বাবা নিরুত্তর। তাকে দেখে অবশ্য মনে হয় তিনি বলার জন্যে শক্ত কিছু খুঁজছেন।

'লোভে পইড়া করছিলা, তাই না ? আমি দুশ্চরিত্রা, আমি অসতী, আমি সংসার করার যোগ্য মাইয়া না— এইসব এহন কও; কিন্তু তখন এমনই লোভ— এইসব কিছুই মাথায় আহে নাই।'

বাবা বিড়বিড় করে কী বলেন তা বোঝা যায় না।

'কী বলছিল তোমারে ? জমি দিব ? এইটা দিব ওইটা দিব ?... হা হা হা, দিছে কিছু ? আধা শতাংশ জমি দিছে ? দিব না। আমার বাপে পিশাচ, আমার ভাইয়েরা পিশাচ। আমার মায়ে ভালা মানুষ, কিন্তু তার কোনো ক্ষমতা নাই। ইসলাম উদ্দিন, তুমি লোভে পড়ছিলা ঠিকই, কিন্তু লাভ করতে পার নাই।'

এসব সময়ের শেষ দিকে এসে বাবা ইসলাম উদ্দিন শুধু গজরাতেন, 'অসতী, অসতী...।'

'এইটা তো আমার ছেলের জন্মের পর থেইকাই কইতাছ, আর আমিও অস্বীকার যাই না।'

'বড় বড় কথা কও, নিজেরে কী ভাব তুমি ?'

'আমি নিজেরে কী ভাবি, এইটা আমার হিসাব। তোমার জানার দরকার নাই।'

এসব কথা বাবুর সামনেই হতো। বাবু এসব শুনতে শুনতে বড় হয়েছে। এ

রকম নানা দিনের কথা মনে আছে তার। দিন-বিশেক বাইরে কাটিয়ে একদিন বাবা বাড়ি ফিরেছেন, ফিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, মা এ সময় বাবুর সামনেই বাবাকে বলেন, 'কাল, না কাল না, পরশু, পরশু রাইতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। ভোর-রাইতের স্বপ্ন, এইটা সত্য হয়।'

মা কী স্বপ্ন দেখেছেন সেটা জানার জন্যে বাবার ভেতরে কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। মা কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র হতোদ্যম হন না, 'দেখলাম তুমি আরেকটা বিয়া করছ।'

বাবার মুখে বিরক্তি দেখা যায়, তোতলাতে আরম্ভ করেন তিনি, 'কী কও, কী কও...!'

'সে আবদার ধরছিল বইলা তারে তুমি নীল রঙের শাড়ি কিন্যা দিছ।'

বাবা এবার কাঁপতে আরম্ভ করেন।

'আচ্ছা, কও তো তুমি, এই স্বপ্ন কি বিশ্বাস যায়?'

বাবা মিনমিনে গলায় কী বলেন বোঝা যায় না।

'কমলারে ওই বাড়িতেই রাখবা, না এই বাড়িতে নিয়া আসবা? নিয়া আসো, আমার কোনো অসুবিধা নাই। গপ করার লোক পাই না।'

বাবা এর মধ্যে গলার জোর কিছুটা ফিরে পেয়েছেন, 'তোমারে কে কইছে এই মিছাকতা?'

'কমলারে এই বাড়িতে নিয়া আসো। তার কুনো দোষ নাই।' মা হাই তোলেন, 'তিন কুলে কেউ নাই তার, আর তুমি কিনা তারে দিছ ধাপ্পা! নিয়া আসো, তারে যত্ন করব।'

'এই কতা কে কইছে তোমারে!' বাবা এইবার আর বলেন না, এটা মিছেকথা।

'ইসলাম উদ্দিন, তুমি তো জানো আমি হঠাৎ একটা-দুইটা খবর পাই। ফলে, ফলেও না।' মা শরীরের আড়মোড়া ভাঙেন, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলেন, 'ঘুমের মইধ্যে কে আমারে এইসব খবর দেয় তা অবশ্য আমি কইতে পারুম না।'

মুন্নী তাকে বলেছিল, 'শোনো, আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে— করতাছি, যাইতাছি, ঘুরতাছি— এইসব বললে হবে না।'

মেয়েটা ছিল অদ্ভুত। বাবুর সঙ্গে হঠাৎ করেই তার পরিচয়, আর পরে অদ্ভুত অসম বন্ধুত্ব। অদ্ভুত এই কারণে যে বাবুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হওয়ার কথা না। কিন্তু কিছু অদ্ভুত ঘটনা সব মানুষের জীবনেই ঘটে।

ঘটনার সূচনা নদীর পারে। বাবু তখন আরো কিছুটা উঁচু ক্লাসে উঠেছে। সম্ভবত সে তখন এইটে। তবে সুন্দরী নদীর পাশে পাশে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসটা তার

বদলায়নি। তবে হ্যাঁ, তখনো সে আগের মতোই মুখচোরা, লাজুক। উল্লেখ করার মতো তার কোনো বন্ধু নেই আর নতুন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কী এক জড়তা এসে যেন তাকে ঘিরেও ধরে।

নদীর পাশ দিয়ে ঘুরছিল বাবু। সুন্দরী নদী তখন আরো একটু মজে গেছে। সুন্দরীর আরো মজে যাওয়ার চেহারা দেখত বাবু, তার খুব জালাল মাস্টারের কথা মনে পড়ত। যদি জালাল মাস্টার থাকতেন তাহলে বাবু বলত, স্যার, আপনি তো ঠিকই বলছিলেন। আপনি বলেছিলেন, সুন্দরী আরো হেজেমজে যাবে, তা-ই তো হয়েছে। কিন্তু এ কথা জালাল মাস্টারকে জিজ্ঞেস করার তখন আর উপায় ছিল না। কারণ বাবু যখন ক্লাস সেভেনের প্রথম দিকে, জালাল মাস্টার আত্মহত্যা করেন। বলা নেই কওয়া নেই কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন ? কেন তিনি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিলেন, তা অজানাই থেকে গেছে, কেউ বুঝতে পারেনি।

নদীর পাশে ঘুরতে এসে জালাল মাস্টারের কথা মনে হয় বাবুর। আর ওই নদীর পাশেই একদিন মেয়েটার সঙ্গে দেখা তার। বাবুর প্রথম দেখাতেই মনে হয় এই মেয়েটাকে ফুল বলাই উচিত হবে! দেখে আসলেও মনে হচ্ছে একটা রঙিন ফুল নদীর ধারে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক, একটা সদ্য ফোটা গোলাপের মতোই সুন্দর মেয়েটি।

চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করেনি, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করেছে, তবে বাবুর লজ্জাও লেগেছে। অচেনা একটা মেয়ের দিকে কি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় ? বাহ্, চেনা মেয়ের দিকেই যায় না, আর এ তো অচেনা মেয়ে! কিন্তু হলো কি, মেয়েটাই তাকে ডেকে বসল, 'এই যে, এই দিকে আসুন তো।'

বাবুর যা হওয়ার তা-ই হলো, হকচকিয়ে গেল সে। চেনে না, আগে কখনো দেখেছে বলেও মনে পড়ে না। একটা অচেনা অপরিচিত মেয়ে ডাকল আর সে হুট করে চলে যাবে ? সে ভান করল, এমন ভান করল, যেন মেয়েটার ডাক শোনেইনি সে!

মেয়েটা কিন্তু থামল না, আবার ডাকল। ঠিক ডাকল না, বলল, 'এই ছেলেটা বোধহয় কানে শোনে না।'

তা মেয়েটাই যখন বলছে সে কানে শোনে না, তখন তার কোনো কথাই বাবুর শোনার কথা না। কিন্তু মেয়েটার বলার মধ্যে কী একটা আক্রমণাত্মক ভাব ছিল, বাবু লজ্জা পেয়ে গেল এবং এমনভাবে তাকাল যে কথাটা সে শুনেছে।

মেয়েটা বলল, 'ও, আপনি কানে শোনেন তাহলে! তা এখানে যে একটু আসতে হয় আপনাকে।'

এগোতে এগোতে বাবু ভাবে, কী টরেটক্কা মেয়ে রে বাবা! মেয়েদের সম্পর্কে তার ধারণা কম, কিন্তু মেয়েরা এভাবে কথা বলে না তা সে মোটামুটি জানে। তা ছাড়া তার চে বয়সে ছোট একটা মেয়ে তার সঙ্গে এভাবে কথা বলবেই বা কেন! এ

রকম ভাবে বটে বাবু, তবে কী যে হয়, মেয়েটার কাছে না গিয়েও পারে না সে।

'আপনার নাম বলতে হবে না।' মেয়েটা বলে, 'শুধু বলুন আপনি এখানকার কি না।'

বাবু মাথা ঝাঁকায়।

'আমিই বোকা।' মেয়েটা হেসে ফেলে, 'আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি এখানকার।'

বাবু কী বলবে বুঝতে পারে না, তাই চুপ থাকে। তবে মেয়েটার দিকেও তাকিয়ে থাকে না সে, তাকিয়ে থাকে অন্যদিকে।

'শুনুন, আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'জি।'

'আপনি এ এলাকার সবকিছুই তো চেনেন। চেনেন না?'

'জি।'

'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। কোন রাস্তায় বাড়ি ফিরব বুঝতে পারছি না।'

বাবু অবাক গলায় বলে, 'কেমনে হারাইলেন?'

মেয়েটার ভ্রূ কুঁচকে যায়, 'আশ্চর্য, কেমনে হারাইলেন' আবার কী ধরনের ভাষা!'

বাবুর এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই।

'মাত্র গতকাল আমরা এখানে এসেছি। আজ বাসায় কাউকে না-বলে বেরিয়েছি। সবাই আমাকে খুঁজছে কিন্তু কেউ পাচ্ছে না। কী মজা! তবে এখন ফিরতে হবে। ডিসি সাহেবের বাসা চেনেন?'

'ওই যে লাল দালান, সামনে বাগান?'

'জি। আমাকে নিয়ে চলেন। ওটাই আপাতত আমাদের বাসা।'

'চলেন।'

মেয়েটা বাবুর একটু পেছন পেছন হাঁটতে আরম্ভ করে। আপন-মনে কতক্ষণ এগোয়, তারপর হঠাৎ করেই বলে, 'আমার নাম মুন্নী। এবার আপনি আপনার নাম বলুন।'

বাবুর সঙ্গে মুন্নীর বন্ধুত্ব দূরের কথা, পরিচয় বা কথাবার্তা হোক, এটাই মুন্নীর বাবা-মা চাননি। সঙ্গত কারণেই তারা ছিলেন সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। জেলা প্রশাসকের মেয়ে এক সেল্‌স রিপ্রেজেনটেটিভের ছেলের সঙ্গে ওঠাবসা করবে, এটা তাদের সমাজ গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং মুন্নীর বাবা-মাকে দোষ দেয়াও যায় না।

কিন্তু মাত্র সেভেনে পড়া এই মেয়েটা দেখতে যেমন অসাধারণ সুন্দরী ছিল, তেমনি ছিল তার জেদ। একবার সে বাবা-মার সঙ্গে রাগ করে টানা তিন দিন কোনো খাবার গ্রহণ করেনি। সুতরাং মুন্নীকে বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

মুন্নীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বাবুর জীবন নানাভাবে বদলে দিয়েছিল। বাবুর কাছে জীবন ছিল ছোট, সীমিত এক পরিসরে আটকে থাকা, মুন্নী কী অবলীলায় সেটা অনেক বড় করে তুলেছিল। তবে তার মধ্যে একই সঙ্গে নির্মমতার প্রকাশ ও অধিকার খাটানোর একটা ব্যাপারও ছিল। অবশ্য যেটাকে নির্মমতা বলা হচ্ছে, সেটা হয়তো নির্মমতা নয়, তার স্বভাবই ছিল ওরকম। সে সরাসরি বাবুকে বলত, 'এই শোনো, এইসব— করতাছি, যাইতাছি, খাইতাছি— ভাষায় কথা বলা কিন্তু আর চলবে না।'

তত দিনে কিছুটা সহজ হয়েছে বাবু, 'সবাই-ই তো কয়।'

'কয় না, ওটা হবে— বলে। সবাই বলে। কিন্তু সবাই বলে, তাই বলে যে তোমাকেও বলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কই, আমি বলি ? আমরা বলি ?'

'তোমাদের কথা আলাদা, তোমরা হইতাছ...।'

'হইতাছ না— হচ্ছ। নাও, আরম্ভ করো।'

'কী ?'

'আমাদের মতো করে কথা বলা শেখো।... হ্যাঁ, বলো...।'

শিক্ষক হিসেবে মুন্নী ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির। গাছের ডাল দিয়ে সে একটা লাঠির মতো বানিয়েছিল। ঠিকমতো বলতে বা উচ্চারণ করতে না পারলে সেই লাঠি দিয়ে বাবুকে সে মারত। মারত জোরেই, তবে বাবুর মনে আছে, কষ্টটা সে অনুভব করত না, বরং মাঝেমধ্যে মুন্নীর মার খাওয়াটা তার কাছে মোটামুটি উপভোগ্য এক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঝামেলা হতো মুন্নীর আবদার মেটাতে গিয়ে। মুন্নীর ছিল বরাবর হুকুম করার শখ। তত দিনে তাদের সম্পর্ক 'তুমি' ছাড়িয়ে 'তুই'-এ গিয়ে ঠেকেছে। মুন্নী বলত, 'এই, এটা করেছিস ?' মুন্নী বলত, 'এই, ওটা করেছিস ?' মুন্নী বলত, 'একটা কাজের কথা তোকে কতবার বলতে হবে রে! তা ছাড়া এটা তো এমন কোনো কঠিন কাজও না যে এত সময় লাগবে!'

'তুই বুঝবি কি, সময় লাগবে কি লাগবে না। কাজটা তো আমি করছি।'

'ও, বোবার মুখে কথা ফুটেছে দেখছি! তা বলে দে, কাজটা তুই করতে পারবি না।'

বাবু ঝামেলায় পড়ে যেত, 'আহা, আমি সে কথা বলেছি নাকি!'

'যদি সে কথা না-ই বলে থাকিস, কাজটা তাড়াতাড়ি কর।'

মুন্নীর জন্যে প্রধান যে কাজটা করতে হতো তার, সেটা হলো ফুল জোগাড় করা। মুন্নীদের বাড়ির সামনেই বিশাল বাগান, সে বাগানে কত রকম ফুলের গাছ, ফুল! তবে অধিকাংশ ফুলই মুন্নীর পছন্দ নয়, 'ওগুলো ফুল! ধ্যাৎ, সব বিদেশি!'

বাবুর কাজ ছিল মুন্নীর জন্যে অবিরাম ফুল জোগাড় করে দেয়া। তবে যেমন-তেমন ফুল হলে চলবে না, এমন ফুল জোগাড় করতে হবে, যেটা দিয়ে আবার মালা গাঁথা যায়। কষ্ট হতো বাবুর, মালা গাঁথার ফুল কি আর সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যায়? তবু বাবু জোগাড় করত, মুন্নী হুকুম করেছে বলে কথা। ফুলের খোঁজে সে চলে যেত দূরদূরান্তে।

ফুল দিয়ে মালা গাঁথত মুন্নী। বিকেলে ছাদে বা বাগানে বসে এত নিবিষ্ট মনে এই কাজটা করত সে, যেন এটা ছাড়া এ বিশ্বজগতে আর কিছুই করার নেই তার। বাবু বলতও সে কথা, 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে মালাটা ঠিকমতো গাঁথতে না পারলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তোকে আমার মালা দেখতে কে বলেছে?'

'তো আর কী করব?'

'বই পড়।... ওই যে, ওই চেয়ারের ওপর দেখ, ওখান থেকে একটা বেছে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দে।'

'আমার ওসব গল্পের বই-টই পড়তে ভালো লাগে না।'

'তা লাগবে কেন, মূর্খ থাকতে চাস তো।... পড় বলছি!'

গল্পের বই পড়ার অভ্যাস বাবুকে মুন্নীই ধরিয়ে দিয়েছিল। মুন্নীদের বাসায় ছিল বড় এক ঘরভর্তি বই। এত বই এ শহরের বা আশপাশের শহরের বড় কোনো বইয়ের দোকানেও ছিল না। প্রথম প্রথম ভালো না লাগলেও ধীরে ধীরে বইয়ের প্রতি তীব্র এক তৃষ্ণা বাবুর ভেতর তৈরি হয়ে যায়।

প্রায় প্রতিদিনই মালা গাঁথত মুন্নী, তারপর কিন্তু সে মালার আর খোঁজ থাকত না। বাবু একদিন কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, 'তুই মালাগুলো দিয়ে কী করিস?'

'কিছু না।'

'আহা, কিছু তো একটা করিস!'

'করি। একে দিই ওকে দিই। আবার কখনো ছিঁড়ে ফেলি।'

'ছিঁড়ে ফেলিস! এত কষ্ট করে তাহলে গাঁথিস কেন?'

'গাঁথতে ভালো লাগে, ছিঁড়তেও ভালো লাগে।'

বাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'তোকে বোঝা বড় মুশকিল মুন্নী।'

'সুতরাং সে চেষ্টাটা করিস না।'

'হুঁ।... মালা গেঁথে একে দিস ওকে দিস, আমাকে তো কখনো দিস না।'

'দেইনি, না ?'

'না।'

'মালা দিয়ে তুই কী করবি ?'

'যা-ই করি না কেন, তুই দিসনি, এটাই হলো কথা।'

'আচ্ছা, দেব।'

'সত্যি ?'

'বাবু, তুই জানিস এক কথা দুবার বলতে আমার ভালো লাগে না।'

বাবু মালা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আর কথা বলে না। মুন্নীই একসময় বলে। সে জানায়, তাকে এই এই ফুল জোগাড় করে দিতে হবে।

'এত সব অদ্ভুত অদ্ভুত ফুল আমি কোথায় পাব ?'

'আমি জানি না। তোকে জোগাড় করতে বলা হয়েছে, তুই জোগাড় করবি।'

'এসব ফুল দিয়ে তুই আর কত মালা গাঁথবি ?'

'একটা।'

'একটা মালা গাঁথার জন্যে এত ফুল লাগে!'

'তুই অনেক ফুল আনবি, আমি তার থেকে বেছে বেছে নেব, সবচে সুন্দর ফুলগুলো নেব।'

'একটা মালায় এত রকম ফুল ব্যবহার করবি ?'

'হুঁ।... মালাটা তোর জন্যে গাঁথব। হয়েছে ?'

তার জন্যে মালা গাঁথবে মুন্নী, সুতরাং বাবু ফুল জোগাড় করার এক আয়োজনে নেমে পড়ে। সে বুঝতে পারছে, এটা হবে একদম অন্যরকম মালা। একটা ফুলের পরে থাকবে অন্যরকম একটা ফুল, তারপর অন্যরকম আরেকটা... এভাবে। দারুণ একটা মালা গেঁথে দেবে মুন্নী, বাবু তাই ফুল জোগাড় করে ফেলে। আর মুন্নীও মালার ফুল বাছতে আরম্ভ করে দেয়, 'একটু সময় লাগবে কিন্তু।'

'লাগুক।'

'মালাটা পাওয়ার পর কী করবি ?'

'করব, একটা কিছু করব।'

মুন্নীর গেঁথে দেয়া মালাটা দিয়ে বাবুর কিছুই করা হয় না। কারণ মালাটা সে হাতেই পায় না। ফুল জোগাড় করে দেয়ার পরের দিন মুন্নীদের বাসায় বাঁধাছাঁদা আরম্ভ হয়ে যায়। মুন্নীর বাবা অন্য শহরে বদলি হয়ে গেছেন।

সে খবর জানতে পেরে মাটির দিকে সেই যে তাকায় বাবু, আর চোখ তোলে না।

মুন্নী বলে, 'বাবু, এই, তুই অমন করছিস কেন! খারাপ কি আমার লাগছে না!'

'তুই আমাকে আগে বলিসনি।'

'কীভাবে বলব, আমি নিজেই জানতাম না। বাড়ির কেউ আমাকে কিছুই বলেনি।'

বাবু হাঁপিয়ে ওঠার মতো করে নিঃশ্বাস ফেলে।

মুন্নী প্রবোধ দেয়, 'বাবু, মন খারাপ করিস না।'

বাবু কেঁদে ফেলে, তা দেখে মুন্নী হকচকিয়ে যায়, এগিয়ে এসে বাবুর হাত ধরে, 'কাঁদছিস কেন?'

বাবুর কান্না থামে না।

'তুই কি পাগল...? এভাবে কেউ কাঁদে?'

বাবুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। সে তখনো থামে না, কাঁদে।

'শোন, আমরা যাব অনেক দূরে। কিন্তু আমি অনেক দূরে যাব না।' মুন্নী একটু হাসার চেষ্টা করে, তবে সে হাসি কান্না হয়ে নেমে আসে। মুন্নী মৃদু গলায় বলে, 'কারণ, তোর কথা আমার সব সময় মনে পড়বে। আর প্রতি সপ্তাহে আমি তোকে দুটো করে চিঠি দেব।...আরো বেশিও দিতে পারি।'

'সত্যি দিবি?'

'বাবু, তুই জানিস আমি মিথ্যা বলি না।'

'জানি।... মুন্নী, তুই মালাটা গেঁথে দিয়ে যা।'

'এখন না।'

'আমার খুব পেতে ইচ্ছে করছে মুন্নী।'

'বললাম তো এখন না। এখন বাসার যে অবস্থা, এ অবস্থায় মালা গাঁথা যাবে না।'

'তাহলে?'

'নতুন জায়গায় গিয়ে আমি মালাটা গাঁথব। তারপর তোকে পাঠিয়ে দেব।'

'পাঠাবি? পাঠাবি তো?'

'কেন পাঠাব না! তোর মনে হচ্ছে আমি পাঠাব না?'

'না।' বাবু চোখ মুছে নেয়, 'আমি জানি তুই পাঠাবি।'

'তুই খুব ভালো বাবু, আমি তোকে কোনো দিন ভুলব না।' মুন্নী বাবুর আরো কাছে এগিয়ে যায়, তার হাতে আলতো করে চিমটি কেটে বলে, 'চিঠিতে তো যোগাযোগ থাকবেই। আর এমনিতেও তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে রে।'

মুন্নীরা বাবুদের শহর ছেড়ে চলে যায়। শহর খাঁখা করতে আরম্ভ করে, এত দিনের এত চেনাজানা অতি পরিচিত শহর বাবুর কাছে অচেনা মনে হয়।

এভাবে এক এক করে অনেক দিন পার হয়ে যায়। মুন্নীরা চলে গেছে সেই কত দিন! চলে যাওয়ার পরদিন থেকে অপেক্ষা। কিন্তু মুন্নীর কোনো চিঠি দূরের শহর থেকে এই শহরে এসে পৌছায় না। আর ফুলের মালা ? না, ফুলের মালাও না। না ফুলের মালা, না একটা চিঠি। মুন্নী তাকে এত সহজে ভুলে গেল!

মায়ের মন তো, বাবুর ম্লান চেহারা দেখতে দেখতে মা এক বিকেলে তাকে কাছে ডাকেন, 'বাজান, সত্য কইরা ক তো, তোর কী হইছে ?'

'মা, আমার কিছু হয়নি।'

'আরে তুই আমার লগে এই ভাষায় কথা কইতাছস ক্যান! তরে না বারণ করছি ?'

'আর বলব না।'

'তুই পারবি না। ওই মাইয়া তোর মগজ ধোলাই কইরা গেছে।' মা হেসে ফেলেন, 'তবু একটা কথা কই— আমরাই শুদ্ধ ভাষায় কথা কই বাজান। তারা কথা কয় বানানো ভাষায়।... এখন ক, তোর কী হইছে ?'

বাবু নিরুত্তর থাকে। কী বলবে সে মাকে ?

মা তার দিকে তাকিয়ে একসময় মুচকি মুচকি হাসতে আরম্ভ করেন, 'বুঝছি।'

কী বুঝেছেন মা ? বাবু তখনই মার দিকে তাকায়।

'এর জন্যে মন খারাপ করনের কী আছে! সে তো এই শহরে চিরদিন থাকার জন্যে আসে নাই। আসছিল ?'

'সে আমাকে বলেছিল চিঠি লিখবে।'

মা ম্লান চোখে বাবুকে দেখেন।

'সে বলেছিল একটা মালা গেঁথে পাঠাবে আমাকে।'

মা কিছুটা হতাশ আর কিছুটা কৌতুকের মিশ্রণ নিয়ে বাবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, 'বাজান, তোর মনে খুব দুঃখ, না ?'

বাবু হ্যাঁ-না কিছুই বলে না, চুপ থাকে।

'হ, তোরে আইজ আমি আমার জীবনের এক দুঃখের কথা কইমু বাজান, তোর জানা উচিত বইলা কইমু। পরে কইতাম, কিন্তু সময় নাই। আর এখন তোর মন খারাপ। মন খারাপের মইধ্যে মন খারাপের কথা শুনলে লাভ আছে। মন খারাপ মন খারাপ কাটাকাটি হইয়া যায়। বাজান, তুই আয়, আয় আমার লগে, ঘরে বইসা কই।'

সন্ধ্যা হবে হবে করছে। আকাশ জুড়ে লালচে আভা, তার কিছুটা ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর, সেই আলোয় মা যে গল্প শোনান, তা বাবুর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সে জানত, সে টের পেত, বাবা-মা'র বড় ধরনের একটা সমস্যা আছে। তাদের

কথা-চালাচালি আর ঝগড়ার মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপার ধরাও পড়ত। কিন্তু এতটা পরিষ্কার আর স্পষ্ট করে সে জানত না।

মা'র শৈশবে প্রেম ছিল পাঁচ ঘর দূরের এরাজের সঙ্গে। এরাজের ছিল অসাধারণ গানের গলা আর কিছুটা খেয়ালিপনা। এই এরাজের প্রেমে পড়েন তার মা। একসময় বিয়েও করেন তারা, পালিয়ে যেতেও বাধ্য হন। কিন্তু আশপাশের কয়েক গ্রাম জুড়ে মার পরিবারের ছিল ব্যাপক প্রভাব। তাদের নিষ্ঠুরতার কথা ছিল লোকের মুখে মুখে। তারা ঠিকই ধরে আনেন মা আর এরাজকে। এরাজ তার পরই উধাও হয়ে যান। মা খুব কান্নাকাটি আরম্ভ করলে জানানো হয়, এরাজকে প্রাণে মেরে ফেলা হয়নি, তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে বহু বহু দূরে। তার পরই ইসলাম উদ্দিনের সঙ্গে মার বিয়ে। ইসলাম উদ্দিন সব জেনেশুনেই মাকে বিয়ে করেন। ইসলাম উদ্দিনকে বলা হয় নগদ টাকা পাবেন তিনি, সম্পত্তি পাবেন...।

বলতে বলতে মা হঠাৎ করে থেমে যান। বিকেলের শেষ আলো তখন ফুরিয়ে গেছে। বাইরে যদিও তেমনটা নয়, ঘরের ভেতরে অনেকটাই অন্ধকার। মা বেশ কিছুটা সময় অন্ধকারের মতো স্থির হয়ে থাকেন, তারপর হঠাৎই অচেনা এক গলায় বলে ওঠেন, 'বাজান, যে ইসলাম উদ্দিনরে তুই বাবা বইলা ডাকস, সে তোর বাবা না।'

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও এতটা অবাক হতো না বাবু, ব্যস, থ হয়ে যায় সে।

'তোর বাবার নাম হইতাছে এরাজ। আমার জীবনের সবচে বড় দুঃখ, আমি যে তারে পাই নাই, এইটা না।' মা বাবুর মাথায় হাত রাখেন, 'সবচে বড় দুঃখ— তুই তারে দেখস নাই, সে তোরে দেখে নাই। কোনো দিন দেখা হইব এই সম্ভাবনাও নাই।'

মা আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকেন, তারপর বলেন, 'বাজান, তোরে এইসব কথা আরো পরে কমু ভাবছিলাম। কিন্তু সময় নাই বাজান, আর দুই মাস।' মা অন্ধকারের মধ্যে আঙুল তুলে দুটো আঙুল দেখান, 'আর মাত্র দুই মাস বাজান।'

ঠিক দু মাসের মাথায় বাবুর মা মারা যান। এমনভাবে মারা যান, যেন দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির পর তিনি একটা সহজ কাজ করতে যাচ্ছেন।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। ইসলাম উদ্দিনেরও অফিসের কাজ নেই, তিনি বাড়িতে। মা একটা মোড়া টেনে ইসলাম উদ্দিনের সামনে বসেন, 'তুমি আমার একটা কথা রাখো নাই। এইবার রাখবা।'

ইসলাম উদ্দিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকান।

'কমলারে ঘরে তুলতে বলছিলাম, কিন্তু তোলো নাই। এইবার তুলবা। তয় আমার সন্দেহ, এত দিন তারে তুমি রাখছ কি না। তা যারেই রাখো না ক্যান, ঘরে নিয়া আসবা।'

ইসলাম উদ্দিন বলেন, 'তুমি এদ্দিন পর এইসব কথা ক্যান কইতেছ ?'

'কইতেছি, কারণ আধঘণ্টা পর আর কইতে পারব না।'

'ক্যান পারবা না ? বাড়ি ছাইড়া যাইতেছ নাকি ?'

মা হাসিমুখে মাথা ঝাঁকান।

'কই যাইতেছ ? এরাজ মিয়ার খবর পাইছ ?'

'বাজান, আয়, কাছে আয়।' মা সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাবুর দিকে ফেরেন, 'আমার কাছে আইসা দাঁড়া।... তোরে কী কঠিন দুনিয়ায় রাইখা যাইতেছি, অথচ তুই হইতাছস নরম। ধমক দিতেও জানস না।'

বাবু কাছে গেলে মা তাকে জড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে আরম্ভ করেন। সেই কান্না কেবল কান্না নয়, হাহাকারে ভরা, যেন এক নিঃস্ব মানুষ গভীর বেদনায় দু কূল ভাসিয়ে কেঁদে যাচ্ছেন। মার কান্না অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেটা যেমন হঠাৎ আরম্ভ হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই থেমে যায়। মা বলেন, 'আমারে বিরক্ত কইরো না, আমি ভেতরের ঘরে গিয়া শুইতাছি।' মা কথাটা এমনভাবে বলেন, যেন দুজনকেই বলেন আবার কাউকেই বলেন না।

মা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। ইসলাম উদ্দিন স্থির বসে থাকেন। বাবু বারান্দায় গিয়ে মার ঘরের জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় টের পায় সে কাঁদছে।

মা মারা যাওয়ার মাস দেড়েক পর ইসলাম উদ্দিন যে মহিলাকে ঘরে তোলেন, বাবু তাকে চেনে না, কখনো দেখেওনি। তার নাম কমলাও না, হাসনা। মহিলার চেহারা ভালো না। বোঁচা নাক, মুখ জুড়ে গুটিবসন্তের দাগ। তবে ইসলাম উদ্দিন তাকে খুবই সম্মান ও সোহাগের সঙ্গে ঘরে তোলেন। ইসলাম উদ্দিন বাবুকে ডাকেন, 'শুনো। এর নাম হাসনা। এ হইতেছে তোমার নয়া মা।'

বাবু ঘাড় নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ওইভাবে দাঁড়ায়া থাকনের মতো কিছু ঘটে নাই।... নতুন মারে সালাম করো।'

হাসনা বলেন, 'না না, সালাম করনের কুনো দরকার নাই।'

'আছে। বাবু, সালাম করো। তারপর কথা আছে।'

বাবু হাসনাকে পা ছুঁয়ে সালাম করলে মহিলা বাবুকে অনেকক্ষণ ধরে দোয়া করেন।

'এত দোয়ার দরকার নাই, আর তোমার দোয়া কামেও লাগব না...।'

মহিলা ব্যথিত গলায় বলেন, 'এইটা তুমি কী কও!'

'ঠিকই কই। কোনখান থেইকা উইঠা আসছ, খেয়াল নাই ? যাও, ভেতরে যাও। কোথায় কী আছে, দেইখা নাও।... বাবু, তুমি থাকো।'

হাসনা একটু ইতস্তত করে ভেতরে যান, বাবু থাকে।

'সরাসরি কই।' ইসলাম উদ্দিন বলেন, 'সরাসরি কওনই ভালো।'

'জি।'

'শুধু জি কইলে হইব ? কও, জি বাবা।'

বাবু চুপ করে থাকে।

রাগ করেন না, ইসলাম উদ্দিন হাসেন, 'আমারে যত বোকা মনে করছ তুমি আর তোমার মা, আমি তত বোকা না। আমার ধারণা, তোমার মা মৃত্যুর আগে তোমারে সব কইয়া গেছে।'

ইসলাম উদ্দিনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বাবু মেঝের দিকে তাকায়।

'কিন্তু আমারেই তো এত দিন বাবা জানছ তুমি। সুতরাং বাবা কইতে কী অসুবিধা ?'

বাবু বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে চুপ থাকে।

'তবে বাবা কইলা না কী কইলা, কথা এইটা না, কথা অন্য। তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষা কবে ?'

বাবু জানায় কবে তার এসএসসি পরীক্ষা।

ইসলাম উদ্দিন বলেন, 'এত দিন বাকি আছে এইটা বুঝতে পারি নাই। তা বাকি যখন আছে, এই বাড়িতেই থাকবা। সব খরচ আমার, তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওন পর্যন্ত। কিন্তু তারপর তোমার আর কুনো দায়িত্ব আমি নিতে পারমু না। তারপর তোমারটা তুমি দেখবা। বুঝতে পারছ ?'

বাবু মাথা ঝাঁকায়।

'বাবু, আমার মুখের সামনে থেইকা যন্ত্রটা সরা।'

'ক্যা ? ডরাস ?'

'আরে, আঁতকা গুলি বাইর হইয়া গেলে!'

'বাইর হইব না।'

'হ, বাইর হইব না, তুই জানস।' রতন গজগজ করতে থাকে।

'রতন, মেরি পিয়ারি রতন...।'

'ইয়ার্কি করবি না বাবু, পার্টির দেখা নাই, মেজাজ খতরনাক, আর তুই যন্ত্র ধরছস...।'

'যদি ট্রিগারও টিপ্যা দেই, এই যন্ত্র থেইকা গুলি বাইর হইব না।'

'যন্ত্র নষ্ট করছস ? ইসমাইল ভাই তোরে...। তোর খবর আছে বাবু।'

'আব্বে না, যন্ত্র ঠিক আছে। কিন্তু আমি না কইলে ট্রিগার টিপলেও এই যন্ত্র থেইকা গুলি বাইর হইব না।'

'পাগলের মতো এইসব কী কস!'

'এইটা আমার পোষা যন্ত্র। মাইনষে কুত্তা পোষে, বিলাই পোষে...।'

'পাগল-ছাগলের লাহান এই সমস্ত কী কস!'

'মাইনষে পাখিও পোষে...। আর আমি এই যন্ত্র পুষছি। আমি ট্রিগার টিপি আর যা-ই করি না ক্যান, মনে মনে 'হ্যাঁ' না-কইলে গুলি বাইর হইব না।'

'তোর যত্তসব বাতাইল্লা কথা। চুপ যা।'

বাবু একদম চুপ করে না, খিকখিক করে হাসতে থাকে।

'খামাখা হাসস ক্যান! তোর হইছেটা কী ?'

'কিছু হয় নাই।'

'তাইলে চুপ থাক।'

'আইজ পার্টি আসব না।'

'তোরে কইছে ?'

'কইছে।'

'কে ?'

বাবু উত্তর না দিয়ে আড়মোড়া ভাঙে। পিস্তলটা রাখে একপাশে। কতক্ষণ গাল চুলকায়, এরপর বলে, 'ভালো লাগতেছে না।'

'পার্টি আসব না, তুই এইটা কী কইরা জানলি ?'

'রতন।' বাবু গম্ভীর গলায় বলে, 'তুই গলা নামায়া কথা ক।'

'না কইলে ?'

'না নামাইলে কিছু না। কিন্তু যা বলছি তা কর। গলা নামা।'

রতন গলা নামিয়ে বলে, 'আমি ইসমাইল ভাইরে এই কতা কমু।'

'কী কইবি ?'

'তুই কেমনে জানলি পার্টি আসব না ? আমার সন্দেহ হইতাছে।'

বাবু হাসে, 'তোর কী মনে হয়, ইসমাইল ভাই তোর কথা বিশ্বাস যাইব ?'

'সেইটার আমি কী জানি! আমার কওনের আমি কমু।'

'কইস। বাবু হাসতে থাকে, 'রতন, তুই কি ইসমাইল ভাইরে আমার চাইতে বেশি চিনস ?' বাবু তাকিয়ে থাকে রতনের দিকে।

রতনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাবু আকাশের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, এ তো ঠিক, ইসমাইল ভাই নামের মানুষটা তার হাতে পিস্তল তুলে দিয়েছে বটে, তবু লোকটার প্রতি চিরজীবন কৃতজ্ঞই থাকবে সে। এই লোক তাকে নতুন জীবন দিয়েছে, দাঁড়ানোর জায়গা দিয়েছে, চোখ-রাঙানোর ক্ষমতা দিয়েছে, আর পকেট ভরে দিয়েছে টাকায়। এই লোক না থাকলে কোথায় থাকত সে, হয়তো সেই কবে হাপিস হয়ে যেত। বাবু এসব ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায়। আর এসব ভাবনা ঘিরে এক এক করে আরো কত ভাবনা এসে জড়ো হয়!

পরীক্ষা শেষ হওয়ার বিকেলে বাড়ি ফিরলেই ইসলাম উদ্দিন তাকে ডাকেন, 'তুমি নিশ্চয়ই মনে রাখছ, আমি তোমারে কী কইছিলাম ?'

যা বলেছিলেন ইসলাম উদ্দিন, তা কখনো ভুলে যাওয়ার কথা নয় বাবুর, ভুলে সে যায়ওনি। কিন্তু কিছুই না-বলে সে চুপ থাকে।

'কখন যাইবা, কিছু ঠিক করছ ?'

'কাল সকালে যাই ?'

'এইটায় আমার আপত্তি নাই। কই যাইবা বইলা ঠিক করছ ?... না, যাউক। এইটা আমার জাননের কী দরকার! তুমি কই যাইবা সেইটা তোমার ব্যাপার।'

'জি।... আমি সঙ্গে কী কী নিতে পারব?'

'তোমার যা যা আছে সব নিতে পারবা। তোমার মায়ের ছবি নিবা না একখান?'

পরদিন খুব সকালে বেরিয়ে পড়ে বাবু। তখনো ইসলাম উদ্দিন কিংবা হাসনা কেউই ঘুম থেকে ওঠেননি। রাতেই সবকিছু গুছিয়ে রেখেছিল সে। তবে 'সবকিছু' বলতে কী-ইবা আর তার সম্পত্তি? পরনের জিনিসপত্র, কয়েকটা খাতা, টুথব্রাশ, চিরুনি, স্যান্ডেল— এ রকম টুকটাক কিছু জিনিস, আর মায়ের একটা হাসিমুখের ছবি।

আর একটা কাজ সে করেছিল। এসএসসি পরীক্ষার পর এই বাড়ি তাকে ছাড়তে হবে, এটা জানার পর পয়সা জমাতে আরম্ভ করেছিল। পয়সা জমানো শব্দ দুটো বললেই তো আর হবে না, পয়সা জমানো এত সহজ কাজ নয়। তা ছাড়া পয়সা সে কোথায় পাবে? কে দেবে তাকে পয়সা? কেন দেবে? তবে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তার। সে টুকটাক টিউশনি করত, যদিও তাদের ছোট শহরে, এসএসসি পরীক্ষা দেবে, এমন একটা ছেলের জন্যে টিউশনি বলতে তেমন কিছু নেই। সে বাজারের দোকানে গিয়েও এটা-সেটা কাজ করত, সে গঞ্জের হোটেল-রেস্তোরাঁয় গিয়েও তাদের হিসাবের খাতা লিখে দিত আর এটা-ওটা ফুটফরমাশ খাটত। যা পেত, সবই সে জমাত। খুব ভালো করে জানত সে, একদম খালি হাতে পা বাড়ানো যায় না বা এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায় শূন্য হাতে কিছু করাও যায় না।

তাকে যে আজন্মের চেনা এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে, এটা তার কোনো কোনো বন্ধু জেনে ফেলেছিল। নানা সময় নানা কারণে মানুষের জীবনে দুর্বল মুহূর্ত তৈরি হয়, সে রকম কোনো দুর্বল মুহূর্তে সে-ই হয়তো বলে ফেলেছিল। বন্ধুদের কাছ থেকেও কিছু সাহায্য এসেছিল, যদিও তা পরিমাণে কম, অপ্রতুল, তবু সব মিলিয়ে কিছু টাকা তার সঞ্চয়ে ছিল।

এসএসসি পরীক্ষা যেদিন শেষ, সেদিন বিকেলে সে মার কবর জিয়ারতের জন্যে যায়, জিয়ারত করে। তার কান্না পায়। কিন্তু সে ঠোঁট কামড়ে ধরে, কাঁদে না। জিয়ারত শেষে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসার সময় মৃদু গলায় বলে, 'যাই মা।'

পরদিন সকালে বাস ধরে সোজা ঢাকায়। একবার সে নানাবাড়ি যাওয়ার কথা ভেবেছিল। কিন্তু মা-ই বলেছেন, ও-বাড়ির একেকটা পিশাচ। সুতরাং নানাবাড়ি গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে কিংবা কুকুর লেলিয়ে দেবে।

তবে শেষ পর্যন্ত সে এক মামার কাছেই গেল। এক দূরসম্পর্কের মামা। অনেক আগেই তিনি ঢাকা শহরে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি ব্যবসার কী এক কাজে বাবুদের শহরে এসেছিলেন, এসেছিলেন বাবুদের বাসায়ও। ঘণ্টাখানেক, না, ঘণ্টখানেকেরও কম সময় ছিলেন। তবে যেটুকু সময় ছিলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে খুব আন্তরিকভাবে কথা বলেছিলেন। বাবা-মা'কে ঢাকায়

তার বাসায় বারেবারে বেড়াতে যেতে বলেছিলেন। বাবুকে ডেকে বলেছিলেন, 'লম্বা হয়েছিস তো বেশ! তবে বয়স যে বেশি হয়নি, সেটা বোঝা যাচ্ছে। আরেকটু বড় হলে ঢাকা চলে আসবি, আমার কাছে, ঠিক আছে?'

এ রকম অনেকেই বলে, কিন্তু ভুলেও ঠিকানা দিয়ে যায় না। ওই মামা ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন, আর ওই ঠিকানাই এখন বাবুর ভরসা।

মামা তাকে চিনতে পারেন।

মামার বাড়ি খুঁজে বের করা, বাড়ির ভেতরে ঢোকা— এসবের জন্যেও কিন্তু তাকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি। সে যে সময় ও-বাড়িতে পৌঁছেছে, তখন মামা বাইরে। সুতরাং অনেকটা সময় বাইরে হাঁটাহাঁটি আর মামার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় থাকা। তা মামা বাড়ি ফিরলেও আরো ঘণ্টাখানেক পর তার ডাক পড়ে ভেতরে।

'তোমার নাম আমার যতদূর মনে পড়ে— বাবু। ঠিক বলেছি?'

'জি।'

'তুমি লম্বাই ছিলে, এখন স্বাস্থ্যটাও ভালো হয়েছে। তবে চেহারার মধ্যে কেমন একটা বিষণ্ন ভাব।... দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো।'

বাবু বসতে বসতে বলে, 'মা মারা গেছেন...।'

'সেই থেকে কি বিষণ্ন ছাপটা পড়েছে চোখেমুখে?...নাহ্, এই প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে না। সে বয়স তোমার হয়নি। তবে সম্ভবত আমার কথাই ঠিক— তোমার নিজের অজান্তেই ব্যাপারটা ঘটে গেছে।'

বাবু বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না। সে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত বৈকি।

'তা বলো তো বাবু, তোমার খবর কী?'

'জি, ভালো।'

'কী পড়ছ এখন?'

'জি, মাত্র এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলো।'

'পরীক্ষা শেষ, তাই বেড়াতে এসেছ?'

'জি...।'

'কেমন হয়েছে পরীক্ষা?'

একটু সময় নেয় বাবু, তারপর বলে, 'ভালোই।'

'আমারও ধারণা তোমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে। তুমি গোছানো ছেলে। যেমন অনেক দিন আগে আমার দেয়া ঠিকানাটা তুমি রেখে দিয়েছ।... এই প্রথম এলে ঢাকায়?'

'খুব ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম।'

'তার পরও দেখো, আমার বাড়ি কিন্তু ঠিকই খুঁজে বের করেছ তুমি। তোমার চেহারায় দুঃখের ছাপ আছে, বলেছি। কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিরও যে ছাপ আছে— এটা বলিনি। এখন বললাম।'

তার চেহারায় বুদ্ধির ছাপ আছে শুনে বাবু বোকার মতো একটু হাসে।

'তা বাবু, তুমি উঠেছ কোথায়?'

বাবু মামার দিকে তাকায়। চোখ ফিরিয়ে নেয়। তাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়।

মামা হাসেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমার এখানেই উঠেছ, মানে উঠতে চাইছ।'

'যদি আপনি অনুমতি দেন।'

'দিলাম। কয়েক দিন বেড়িয়ে যাবে...।'

'মামা, আমি বেড়াতে আসিনি।'

মামা তার দিকে তাকান, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর বলেন, 'দাঁড়াও, তুমি কী জন্যে এসেছ সেটা এখনই বোলো না। আমি একটু আন্দাজ করার চেষ্টা করে দেখি, পারি কি না।' এই বলে মামা আবারও তাকান, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তুমি বেড়াতে আসোনি, কিন্তু কী কারণে এসেছ তার কোনো ছাপ তোমার মুখে পড়েনি।... অবশ্য সহজ একটা অনুমান করা যায়, তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। অ্যাম আই রাইট?'

বাবুর মুখে আবার বোকার মতো একটা হাসি ভেসে ওঠে।

'তা তুমি কী করবে বলে ঠিক করেছ? মাত্র এসএসসি দিয়েছ, বয়সও কম...।'

বোকা বোকা হাসিটা বাবু মুখ থেকে সরাতে পারে না।

'আমি জানি তোমার মাথায় কী চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। বলব? দেখো তো আমার অনুমান ঠিক কি না।'

বাবু কিছু বলার আগেই মামা আবার মুখ খোলেন, 'তোমার মাথায় অনেকগুলো চিন্তা। এক. তুমি এখানে থাকবে ভাবছ, ভাবছ এখানে থেকে লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবে। হয়তো আমিই তোমার পড়ার খরচ যোগাব। দুই. তুমি চাকরি খুঁজবে। কিংবা আমাকে বলবে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে। তিন. তুমি এ ছাড়া অদ্ভুত চিন্তাও নিশ্চয়ই করছ। এই ভাবনাটা মাঝে মাঝে তোমার মাথায় আসছে। ভাবনাটা এ রকম— অলৌকিক কিছু ঘটবে, তোমার অবস্থা অদ্ভুত সুন্দরভাবে এগিয়ে চলবে। কীভাবে সেটা হবে, তা অবশ্য তুমি জানো না।... এখন বলো, আমি কি কথাগুলো ভুল বললাম?'

বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, যেন সে মামার প্রশ্নের সত্য উত্তর দেবে না মিথ্যা,

এটা বুঝতে পারছে না। শেষে সে বলে, 'মামা, আপনার কথা ঠিক।'

'তোমার বলার ধরন এবং এতক্ষণ ধরে তোমাকে অবজার্ভ করে আমার কী ধারণা জন্মেছে তোমার সম্পর্কে, জানো?'

বাবু কিছু না-বলে মামার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার বয়সের তুলনায় ম্যাচিউরিটি বেশি। তুমি পরিবেশগত কারণে এক ধরনের গাম্ভীর্যও অর্জন করেছ। তবে সমস্যা হচ্ছে কী, জানো— সবকিছু ঠিক ঠিক বোঝার মতো ম্যাচিউরিটি তোমার এখনো আসেনি। অবশ্য অনেকের সেটা কখনোই আসে না। এত কথা কেন বলছি, বলো তো?'

'মামা, আমি বলতে পারব না। আমি বুঝতে পারছি না।'

'তোমার যথেষ্ট ম্যাচিউরিটি আসেনি— এটা বলছি এ কারণে যে তুমি তোমার যে ভাবনাগুলো নিয়ে এ বাসায় এসে উঠেছ, তার একটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। বাবু, পৃথিবীটা এত সহজ জায়গা না।'

মামার কথা কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা অনুমান করার চেষ্টা করে বাবু। সে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের ক্লান্তিও বোধ করে।

'আমি তো তোমার বেশ দূরসম্পর্কের মামা, তাই না?'

'জি।'

'এত দূরসম্পর্কের মামা হয়ে কেন আমি তোমাকে আমার বাসায় থাকতে দেব, বলো? তাহলে পরদিন এইজন, পরশুদিন ওইজন একই আবদার নিয়ে আসবে। তাদের আমি 'না' বলব কোন যুক্তিতে?'

কিছু না-বলে বাবু এদিক-ওদিক তাকায়।

'তোমার দ্বিতীয় চিন্তাটা, যদিও তোমার ম্যাচিউরিটি আছে বলে আমি বলেছি, খুবই ছেলেমানুষি। তুমি মাত্র এসএসসি দিয়েছ, রেজাল্ট হয়নি, কেমন হবে জানা নেই, ধরে নিলাম ভালোই হবে, কিন্তু মাত্র এসএসসি দেয়া একটা ছেলে কী চাকরি পাবে, আর কীভাবেই বা সে সেই চাকরি করবে!'

কিছু বলার মতো খুঁজে পায় না বাবু। এবার এদিক-ওদিক তাকানো বন্ধ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

'অ্যানসার মি ইয়াং ম্যান। আই ওয়ান্ট অ্যান অ্যানসার ফ্রম ইউ। ডু ইউ হ্যাভ এনি?... আমার ধারণা এই উত্তর তুমি জানো না, জানার কথাও না। কারণ, এটা কেউ বলতে পারবে না।'

'আমি আর ফিরে যাব না।' বাবু এবার মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বলে, 'আমার এখানেই কিছু একটা করতে হবে।'

'খুব ভালো কথা। তবে তোমার এ কথার উত্তর দেয়ার আগে, তোমার তিন নম্বর

মনোবাসনার ব্যাপারে কিছু বলে নিই। তোমার বয়স কম— তাই তুমি অলৌকিক কিছু ঘটে যাওয়ার কথাও ভাবছ।... দেখো বাবু, কোনো কোনো মানুষের জীবনে কখনো-সখনো অলৌকিক কিছু যে ঘটেনি, তা নয়। কিন্তু মাত্র এসএসসি দেয়া তোমার জীবনে তেমন কিছু ঘটবে, এটা আশা করাই বোকামি। কারণ, তুমি সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই নেই। তা ছাড়া অলৌকিক কিছু বলে-কয়ে আসে না, তার জন্য অপেক্ষা করারও কোনো মানে হয় না। ওসব চিন্তা তুমি বাদ দাও।... আর এখন এই একটু আগে যে কথাটা তুমি বললে, তা তুমি কী করবে এখানে?'

'দরকার হলে ভিক্ষা করব। আমার আর কিছুই করার নেই।'

'ভিক্ষা সবাইকে দিয়ে হয় না। অনেক দেখেছি, তাই বলতে পারি— তুমি ভিক্ষা করার ছেলে নও।... অবশ্য এ বয়সে এ ধরনের রোমান্টিক চিন্তা থাকে।'

'তাহলে কী করব আমি... ভিক্ষাও করা হবে না...।'

বাবুর এ প্রশ্নের উত্তর দেন না মামা, তিনি সামান্যক্ষণ মাথা চুলকে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙেন, বাবুর দিকে সরাসরি তাকান, 'আমি কথা একটু বেশি বলি, না?'

এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলা উচিত, কিংবা ওটা আদৌ একটা প্রশ্ন, না কথার কথা, তা বাবুর জানা নেই। তাই সে চুপ করে থাকে।

'কী করব বলো!' মামা হাসেন, 'কথা বলা ছাড়া আমার যে আর কিছু করার নেই। কিংবা আর কিছু করার নেই বলেই কথা বলা বাড়ছে। তাই কি?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবু বলে, 'মামা, আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'জানি।' মামা হাত উঠিয়ে তাকে থামান, 'সমস্যা হচ্ছে, আমার সত্যি কিছু করার নেই...।'

'আপনার ব্যবসা...?'

'একদম গোছানো। বড় বেতনে চাকরি করছে কয়েকজন। তাদের সব বুঝিয়ে দেয়া আছে। স্মার্ট ছেলে একেকটা। এখন ওরাই সব সামলাতে পারে। আমি শুধু মাঝে মাঝে খবর রাখি চুরি-টুরি হচ্ছে কি না।... হয় না বলেই ধারণা।'

বাবু বলে, 'জি।' 'জি' সে কেন বলে নিজেই বুঝতে পারে না।

'বড় একটা সমস্যা হয়ে গেছে আমার।' মামা যেন আপন-মনে বলেন, 'এমন কী বয়স হয়েছে আমার, এ বয়সেই যদি দেখি কিছু করার নেই, ব্যবসা থেকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা আসছে, তবে তো সমস্যাই।' মামা বাবুর দিকে তাকান, অনাহূত মৃদু হাসেন, 'অনেকে কী করে, জানো? এক ব্যবসা গুছিয়ে নিয়ে আরেক ব্যবসায় যায়, সে ব্যবসা থেকে আবার আরেক ব্যবসায়।... আমার ভালো লাগে না। নিজেকে এত ছড়িয়ে কী লাভ!... যদিও আমার যে সূচনা, তাতে নিজেকে আরো, আরো উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকার কথা।'

বাবু কিছু বলে না। কারণ তার মনে হয়, মামা এখন নিজে থেকেই বাকিটা বলবেন।

মামা বলেন, 'আমি শূন্য হাতে আরম্ভ করেছিলাম। শূন্য হাতে যারা আরম্ভ করে তাদের ভেতর উঁচুতে, আরো উঁচুতে ওঠার বাসনা থাকে। যেন সে যে একসময় শূন্য হাত ছিল, এটা মুছে দেবে। যেন সবাইকে দেখিয়ে দেবে কত উঁচুতে সে উঠেছে।... আমার ভেতর এ ব্যাপারটা কেন নেই, এটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না। যখনই আমি টের পেলাম, কোনো অবস্থাতেই আমার অবস্থানের অবনতি ঘটবে না, তখনই নতুন কিছু করার ইচ্ছা আমার মরে গেল। এখন একটা কথা বলি। অবশ্য মাত্র এসএসসি দেয়া একটা ছেলেকে এত এত কথা বলা উচিত হচ্ছে না।... বাবু...।'

'জি মামা।'

'তুমি কী ঠিক করেছ?'

'আমি... মামা, আমি কিছু ঠিক করিনি।'

মামা হাসেন, 'কিছু তো তোমাকে ঠিক করতেই হবে।'

এ কথা তখন বাবুর চেয়ে ভালো আর কে জানত? এসএসসি দিয়ে সতেরো বছর বয়সে সে চলে এসেছে এক অচেনা-অজানা পরিবেশে। এখানে কী করবে সে? আরো পড়াশোনা? তা কোথায় থাকবে সে, আর কে যোগাবে পড়াশোনার খরচ? চাকরি খুঁজবে? এ পড়াশোনায় আর এ বয়সে চাকরির চিন্তা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু নয়, মামা বলেছেন সেটা। আর ভেতরে ভেতরে নিজেও তো সে সেটা জানত। বাকি থাকল অলৌকিক কিছু চিন্তা। হ্যাঁ, মামার ধরতে একটুও ভুল হয়নি। ট্রেনে করে ঢাকা আসতে আসতে কত অদ্ভুত চিন্তাই না তার মাথায় এসেছে! চোখের সামনে ভেসে উঠেছে কত দৃশ্য। বিশাল তার বাড়ি, অঢেল তার টাকা, অনেকগুলো গাড়ি। কখনো দেখেছে এই পরিবেশে মা আর সে বসে গল্প করছে। তার বয়স হয়েছে, কিন্তু মার একটুও বয়স হয়নি। তবে এ তো ঠিক যে ওসব হচ্ছে অতিকল্পনা, ওগুলো হচ্ছে মনের ব্যাকরণহীন ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ। এমনিতে, এমনিতে সে তো কিছুই না। এখানে কিছু না হলে পথে পথে ঘুরতে হবে তাকে। কী অদ্ভুত, তার ফিরে যাওয়ারও কোনো জায়গা নেই।

'মামা।' সে বলে।

'বলো।'

'মামা, আপনি আমার একটা ব্যবস্থা করে দেন।'

মামা বাবুর দিকে তাকান।

'আমি পড়াশোনায় ভালো, যদি পড়াশোনাটা হয়... না হলে যে-কোনো একটা চাকরি... মামা, আমি আর ফিরে যেতে পারব না।'

মামা মুখে হাসি নিয়ে তার কথা শোনেন। একসময় তার হাসিটা বড় হয়, তিনি বাবুর দিকে ফেরেন, 'বাবু, তুমি কি আমাকে বোঝাতে পারবে, কেন আমি তোমার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করব?'

বাবু হঠাৎ এ রকম এক প্রশ্নে ভড়কে যায়। সে কী বলবে বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার জন্যে জবাব দেয়াটা কঠিন, কিন্তু আমার জন্যে আমার এই প্রশ্নের জবাব দেয়াটা সহজ। সুতরাং আমিই জবাব দিই, কী বলো?'

'জি।'

'আমি তোমার বেশ দূরসম্পর্কের মামা, তাই না? যোগাযোগও তেমন ছিল না কখনো। এখন তুমি হুট করে এসে বলবে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে, তা তো হয় না। হয়?'

বাবু যেন নিজের অজান্তেই দুপাশে মাথা নাড়ে।

'আমার মনে কিন্তু দয়ামায়াও খুব কম যে দূরসম্পর্কের আত্মীয় হলেও দয়ার বশে কিছু করে বসব। বুঝতে পারছ?'

'জি।'

'কেন করব? কে করে এই যুগে? তা ছাড়া মাত্র এসএসসি দিয়েছ তুমি। তোমার ব্যবস্থা করা কঠিন, দীর্ঘমেয়াদি একটা ব্যাপার।'

'মামা...।'

'তবে সবচে বড় কথা ওটাই— কেন করব! কই, আমার জন্যে তো কেউ কখনো কিছু করেনি! আমি হচ্ছি সেল্‌ফ্‌ মেড ম্যান। অবশ্য তোমার বয়সে না, আরো পরে, যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন তোমার মতো অবস্থা হয় আমার। সামান্য সাহায্য আমি কোনো জায়গা থেকে, কারো কাছ থেকে পাইনি। যা করেছি নিজে করেছি। অমানুষিক কষ্ট করেছি, অপমানে নীল হয়েছি— তবে হ্যাঁ, পিছিয়ে আসিনি। আর পিছিয়ে আসিনি বলেই বোধহয় আমি সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় আজ এখানে। এখন বলো তুমি, আমার জন্যে যদি কেউ কিছু না করে থাকে, তাহলে আমি কেন তোমার জন্যে করতে যাব?'

বাবুর একটুও ভাবতে হয় না, সে তখনই বলে, 'কারণ আপনি জানেন ওরকম অবস্থায় পড়লে কেমন লাগে।'

'কথা তো দেখি ভালোই বলো।' মামা কিছুক্ষণ বাবুর দিকে তাকিয়ে থাকেন, 'ওই অবস্থা কতটা ভয়াবহ, কষ্টের, সেটা আমি জানি বলেই করতে হবে?'

'মামা,... কয়েকটা দিন থাকতে দেন আমাকে, আমি... আমি কিছু একটা করবই।'

'তাই ? তা একটা এক্সপেরিমেন্ট অবশ্য করা যেতে পারে।'

বাবু জিজ্ঞাসু চোখে মামার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তোমাকে ধরো থাকতে দিলাম এ বাসায়। ধরো, দিলাম। অল্প কয়েক দিনের জন্যে অবশ্য। এই সময়টায় আমি তোমাকে অবজার্ভ করব। যদি বুঝি তোমার মধ্যে বড় কিছু হওয়ার পটেনশিয়ালিটি আছে, থেকে যাবে তুমি। আর যদি বুঝি তোমার মধ্যে কিছু নেই, তোমার ভেতরটা ফাঁকা, তবে পত্রপাঠ বিদায় বলে একটা কথা আছে না, সে রকমই কিছু ঘটবে। রাজি ?'

রাজি না মানে ? রাজি তো বটেই সে। ওই মুহূর্তে এর চে ভালো প্রস্তাব তার জন্যে আর কী হতে পারে! সে মামাকে লুকিয়ে দু চোখের কোণ মুছে নেয়।

ও-বাড়িতে প্রথম কয়েকটা মাস ছিল অসাধারণ সুন্দর। বিশাল এক বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান, পেছনে শাক-সবজি আর ফলের গাছ। একপাশে ছোট একটা সুইমিং পুলও আছে। কেউ অবশ্য ওখানে সাঁতরায় না। শুধু মামাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় কখনো সেই সুইমিং পুলের কাছে অলসভঙ্গিতে বসে আছেন। ওই সময়টায় তিনি একা থাকতেই ভালোবাসেন, কেউ কাছে গেলে বিরক্ত হন। এমন চোখে তাকান, যেন চিনতেই পারছেন না। বাকি সময় অবশ্য মামা একেবারেই অন্যরকম। তার গল্পের ঝুড়ি বিশাল। কথা আরম্ভ করলে একের পর এক গল্প বেরোতেই থাকে। আর মাঝে মাঝেই বলেন নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণের কথা। বলেই জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা বাবু, তোমার কী মনে হয়, আমি যে কথাটা বললাম সেটা কি ঠিক ?'

মামার এই যে এত কথা, তা কেবল বাইরের লোকের সঙ্গেই নয়, বাবুর সঙ্গে, বাড়ির কেয়ারটেকারের সঙ্গে, অফিসের লোকজন এলে তাদের সঙ্গে, এমনকি কাউকে না পেলে ড্রাইভার বা বাড়ির কোনো কাজের লোকের সঙ্গেও। এ বাড়িতে লোকজন কম, কম মানে বাড়ির মালিক যারা, তারা সংখ্যায় কম। মামা, মামি আর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে আবার পড়াশোনার জন্যে বিদেশে। আমেরিকা। সুতরাং সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে তিনজন। মামির সঙ্গে বাবুর দেখা হয়নি বললেই চলে। তিনি প্রায় সারা দিনই দোতলায় নিজের ঘরে থাকেন। কখনো বাইরে ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠা, কিংবা গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢোকা— এ সময়টায় কারো দিকে ফিরেও তাকান না। বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। কেন যেন মামাই সেটা করিয়ে দেননি, নিজে থেকে পরিচিত হওয়ার সাহস বাবুরও হয়নি।

বাসায় আর আছে জেরিন। বাবুর চে বয়সে কিছু বড়। এইচএসসি পাস করে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। এ মেয়েটিও কারো সঙ্গে কথা বলে না, মামার সঙ্গেও তাকে কথা বলতে দেখেনি বাবু। তবে মেয়েটা এর-ওর দিকে মাঝে মাঝে তাকায়। বাবুর দিকেও তাকিয়েছে কখনো। অবশ্য সেটা নিতান্তই হেলাফেলায়। মেয়েটার

তাকানোর ধরনটাই এ রকম। তা ছাড়া কে তার দিকে কীভাবে তাকাল, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তার নেই। সে থাকার একটা জায়গা পেয়েছে, খাবার পাচ্ছে সময়মতো, এটাই তার কাছে তখন অনেক বড় ব্যাপার। কিছুটা দুশ্চিন্তাও অবশ্য তার মাথায় আছে। সে বুঝতে পারছে না এরপর কী হবে। এসএসসির রেজাল্ট বের হবে একসময়, তারপর ? মামার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছে, মামা কী এক উদাসীনতায় ব্যাপারটাকে একটুও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাকে তো আর জোর করে এ প্রসঙ্গে টেনে আনা যায় না। এই যখন তার অবস্থা, তখন কে তার দিকে তাকাল না, কে তাকালেও তাকাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, কে জিনসের প্যান্ট আর গোলাপি শার্ট পরে গাড়ি চালিয়ে ভুঁশ করে বেরিয়ে গেল, কে লনে বসে একেক দিন একেক ছেলেবন্ধুর সঙ্গে গল্প করল, এসব নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যায় না। বাবু ব্যস্ত কখনো হয়নিও।

কখনো ব্যস্ত হয়নি সে, তবু আচমকা ঝড় নেমে এল তার ওপর। অথচ তত দিনে ও-বাড়িতে অনেকটা গুছিয়ে বসেছে সে। পাশাপাশি সুন্দর একটা ভবিষ্যতের স্বপ্নও দেখছে। মামার গল্প করার লোক নেই। যে কজন আছে, তার মধ্যে সে হচ্ছে প্রধানতম। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে নিজের কথা বলতে বলতে নিজের অবস্থান সে অনেকটাই পোক্ত করে ফেলেছে। মামা তত দিনে তাকে তুই করে বলতে আরম্ভ করেছেন, 'কী, এইচএসসিতে ভর্তি হবি আর সব খরচ আমাকেই দিতে হবে, না ?'

বাবু কিছু না-বলে লাজুক হাসি হাসে।

'উঁহু, অত সহজেই আমি তোকে কথা দিচ্ছি না। আগে তোর এসএসসির রেজাল্ট দেখি। রেজাল্ট ভালো না হলে কানে ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব।'

বাবুর রেজাল্ট দেখে মামা অনেকটা সময় হতবাক হয়ে থাকেন। বাবু নিজে অবশ্য অতটা অবাক হয় না। এতটা ভালো হবে, সেটা সে ধারণা করেনি। তবে রেজাল্ট যে ভালো হবে, তা সে জানত। তাদের বোর্ডে মেধা তালিকায় তার নাম উঠেছে প্রথম বিশজনের মধ্যে অষ্টাদশ।

মামা সুস্থির হওয়ার পরই জোরে চেঁচিয়ে কেয়ারটেকারকে ডাকেন, 'মিষ্টি। ভালো মিষ্টি। অনেক মিষ্টি। আজ ওর রেজাল্ট আউট হয়েছে।' এই বলে তিনি বাবুর দিকে ফেরেন, মাথা চুলকাতে চুলকাতে বোকার মতো হাসেন, 'তুই তো দারুণ রেজাল্ট করেছিস রে! আমাকে তাহলে আমার কথা উইথড্র করতে হচ্ছে। তোকে কান ধরে বের করে দেয়ার প্রশ্নই উঠছে না। এখন আমার কাজ হবে শহরের সেরা কলেজে তোকে ভর্তি করে দেয়া। আর তুইও খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। তবে একটা কথা কিন্তু এখনই বলে রাখছি। এইচএসসির রেজাল্ট যদি খারাপ হয়, তবে কিন্তু তোকে ঠিকই কান ধরে এ বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হবে, কেউই ঠেকাতে পারবে না।'

আনন্দের পাশাপাশি বারবার মায়ের কথা মনে হওয়ায় বাবুর মনটা ভার ভারও হয়ে থাকে। মামা অবশ্য আনন্দটাই ধরে রাখতে চান। যদিও ওই আনন্দে অংশীদার

শুধু একতলার লোকজন। দোতলায় যে দুজন, তাদের এতে কোনো অংশগ্রহণ নেই।

তবে অংশগ্রহণ যে তাদের একজন করতে চায় না, তাও নয়। কিন্তু সেটা তার নিজের মতো করে। মাঝরাতের কিছু পরে দরজায় টোকা শুনতে পেয়ে বাবুর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমটা অবশ্য তার সুখে-দুঃখে পাতলাই ছিল। সে বিছানায় উঠে বসে, 'কে ?'

কোনো উত্তর আসে না, আবার টোকা পড়ে, অনেকটা তবলার বোলের মতো আওয়াজ হয়। বাবু ভাবে, 'কে' এটা জিজ্ঞেস করার তো কোনো মানে হয় না। কারণ কে আর হবে মামা ছাড়া। হয়তো এই রাতেও তার গল্প করার ইচ্ছে জেগেছে। বাবু দ্রুত বিছানা ছেড়ে নেমে দরজা খোলে। বিরক্তি বোধ করে না সে। ভাবে, ঘুম যখন গভীর হচ্ছে না বরং ঘুমের মধ্যে একটা ছটফটানি, তখন মামার সঙ্গে গল্প করতে তার ভালোই লাগবে।

দরজা খুলে বাবু দেখে সামনে অলসভঙ্গিতে জেরিন দাঁড়িয়ে। এত রাতে জেরিন কেন তার ঘরের দরজায়! যদি এমন হতো, এই মামাতো বোনের সঙ্গে তার যথেষ্ট সখ্য, প্রায়ই তার সঙ্গে গল্প করে বন্ধুর মতো, তাহলে হয়তো একটা যুক্তি দাঁড় করানো যেত। কিন্তু এই মামাতো বোনটির সঙ্গে জীবনেও বাবুর কখনো কথা হয়নি, মেয়েটি তার দিকে তাকালেও তাকিয়েছে তাচ্ছিল্য ভাব নিয়ে হেলাফেলায়। সেই মেয়ে কেন এত রাতে তার কাছে এসেছে! কী এমন দরকার পড়েছে তার!

বিস্ময় কাটে না বাবুর, সে ঢোক গিলে বলে, 'আপা...।'

'আপা!'

'জি... আপা...।' বলতে বলতে বাবু জেরিনের দিকে কিছুটা সরাসরি তাকায়। সে দেখতে পায় মেয়েটি আসলে অসাধারণ সুন্দর। এখন তার পরনে খুবই স্বচ্ছ পোশাক, যেন পাতলা ফিনফিনে কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে, আর মেয়েটিকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ ভঙ্গিতেই সে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বাবু বুঝতে পারছে তার মধ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে।

'আপা...।' বাবু আবার বলে।

'কী আশ্চর্য, দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি ?' বলে তাকে প্রায় ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়ে জেরিন। বাবু একটু পিছিয়ে যায়। জেরিন দরজা ভেজিয়ে দেয়। বিছানায় বসতে বসতে বলে, 'শুনলাম, খুব নাকি ভালো রেজাল্ট করেছ ?'

'জি।' বাবু দূরে দাঁড়িয়ে বলে।

'মানে তুমি ভালো ছাত্র।' জেরিন হাসে, 'আমার অনেক বন্ধু, কিন্তু— ভালো ছাত্র— এমন কোনো বন্ধু নেই।'

'জি।'

'এখন বলো তো দেখি, এত রাতে আমি চুপি চুপি কেন এসেছি তোমার ঘরে ?'

বাবু ভড়কে যায়, এদিক-ওদিক তাকায়। দেখে, জেরিন মুখে মুচকি হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবু তোতলায়, 'আপা, ব-ব-বলতে পারব না।'

'কী বারবার আপা আপা করছ! কিসের আপা!'

'কী বলব!' বাবু অবাক।

'আচ্ছা, আপাই বলো। ওতে অসুবিধা নেই। বরং তুমি আপা ডাকলে আমার একটা কর্তৃত্ব থাকবে, অর্থাৎ আমার কথা তোমার শুনতে হবে।'

'কী কথা আপা?'

'আচ্ছা, তুমি কি সত্যি বুঝতে পারছ না, কেন আমি তোমার কাছে এসেছি?'

কী উত্তর দেবে বুঝতে না-পেরে বাবু ফ্যালফ্যাল করে জেরিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তুমি একটা গর্দভ।' জেরিন বিরক্ত গলায় বলে, 'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি কীভাবে ভালো রেজাল্ট করলে বুঝতে পারছি না।'

বাবুর বলার ইচ্ছে হয়, 'আপনার বুঝতে হবে না, আপনি এ ঘর থেকে যান।' কিন্তু এ কথা বলার সাহস তার হয় না।

'তোমার ঘরে এসেছি তোমাকে রিওয়ার্ড দেওয়ার জন্য। আফটার অল রেজাল্ট ভালো করলে।' জেরিন ঘরের এদিক-ওদিক তাকায়, বাবুর দিকে ফেরে, 'তা, কী রিওয়ার্ড চাও তুমি?'

বাবুও তো বড় হয়েছে, অনেক ব্যাপারই বুঝতে শিখেছে, বুঝতে পারে, তার বুকের ভেতরটা ধড়াশ ধড়াশ করে ওঠে, সে ঢোক গেলে, 'আপা, কাল আমরা কথা বলব?'

'হ্যাঁ, কথা বলব না কেন, অবশ্যই বলব। তবে এখন আমরা কাজ করব। কী কাজ, বলো তো, দেখি তোমার বুদ্ধি কেমন?'

'আপা, প্লিজ, আপনি এ ঘর থেকে যান।'

'না গেলে?'

'আপা, আপনি আমার বড় বোন...।'

'না গেলে কি চিৎকার করবে?'

'আপা প্লিজ।'

'আমার কথা না শুনলে চিৎকার কিন্তু আমিই করব।'

'আপা...!'

'চিৎকার করব এই বলে যে, ঘুম না আসায় আমি বারান্দায় একা একা হাঁটছিলাম, তুমি আমার মুখ চেপে ধরে তোমার ঘরে জোর করে টেনে এনেছ।'

বাবুর কেঁদে ফেলার অবস্থা হয়, 'আমার তাহলে এ বাসায় আর থাকা হবে না।'

'আমার কথা না শুনলেও তোমার এ বাড়িতে থাকা হবে না।'

বাবু ভয় পায়, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

'শোনো। রোজই যে তোমার এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা কিন্তু নয়। যদি আজ ভালো পার, তাহলে কখনো-সখনো আসব। নইলে আমার তো রেহান, বাপ্পি, শাকিল, এরা আছেই। এদের কথা কী বলব তোমাকে।'

'আপা, আমি আপনার পা ধরি।'

'কাছে এসো। কাছে এলে আমি বলে দিচ্ছি কী করতে হবে।'

'আপা...।'

'শিট! এত আপা আপা কোরো না তো! অবশ্য ভালো লাগছে আমার। কাছে এসো।'

কিন্তু ততক্ষণে বাবু নড়ার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলে।

জেরিন বিছানা ছেড়ে উঠে বাবুর কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে হাত ধরে, তার পরই নিজের শরীর দিয়ে বাবুর শরীর এমনভাবে চেপে ধরে, বাবুর অবস্থা হয় দিশেহারা। সে টের পায়, সব সংস্কারের পরও তার শরীর জেগে উঠছে, প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে সে। মনে হচ্ছে এই জেরিনকে সে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারবে। আবার ভেতর থেকে কে যেন প্রবলভাবে বলে ওঠে— 'উচিত হচ্ছে না, উচিত হচ্ছে না। অনুচিত, অনুচিত।'

কে এমন তীব্রভাবে বলে ওঠে ওই কথা ? বাবু কি মার কণ্ঠস্বর শোনে ? বাবু ঠিক বুঝতে পারে না। বাবু কি মুন্নীর কথা শোনে ? বাবু ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সে খুব অবাক হয়। এত দিন পর হঠাৎ মুন্নীর কথা কেন তার মনে হলো ? তবে কি মুন্নী এখনো তার ভেতরে অজান্তেই রয়ে গেছে ? কিন্তু তখন অত বিস্তারিত ভাবার সময় নেই। বাবু টের পায়, তার ভেতরে প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যে, যে তাকে শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে, সেও বসে নেই। সেও আরো প্রবল হয়ে উঠে তাকে পিষে ফেলতে চাইছে, তাকে বিছানার দিকে টেনে নিতে চাইছে। ঠেলে তাকে সরিয়ে দেবে ভাবে, তার আগেই এক ঘটনা ঘটে, ভেজানো দরজা খুলে যায়।

বাবু দেখে, মামা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে পাগলাটে দেখাচ্ছে। চোখ ঘোরলাগা, মুখ ভাবলেশহীন, যেন দরজার ওপাশে এমন একটা দৃশ্যের জন্যে তিনি অপেক্ষাই করছিলেন।

বাবুর ভেতরে-বাইরে কুঁচকে যায়। মামা অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখেছেন, এই এক ভয়। আরেক ভয়, জেরিন এখনই উঠে বলবে, বাবু তাকে মুখ চেপে ধরে এই ঘরে টেনে এনেছে।

বাবুকে অবাক করে দিয়ে জেরিন এর কিছুই করে না। সে বাবুকে ছেড়ে দেয়। এমন একটা ভঙ্গি করে যায়, যেন বোঝায় কিছুই হয়নি। বাবাকে পাশ কাটিয়ে সে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বাবু টের পায়, মামা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। এখন মামাকে সবটা খুলে বলতে হবে। মামা তাকে বিশ্বাস করবেন তো ? বিশ্বাস করা উচিত। এত দিন ধরে মামা তাকে দেখছেন না ? মামা কি বুঝবেন না এমন একটা কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব কি সম্ভব না ?

বাবুর মুখ তোলার ও খোলার প্রস্তুতি নেই। তার আগেই কানে এসে পৌছায় গানের মৃদু সুর। কেউ মৃদু গলায় গান গাইছে। সেই গান মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে একসময় মিলিয়ে যায়। বাবু স্তম্ভিত হয়ে যায়। জেরিন গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে! ব্যাপারটা এতই সহজ তার কাছে!

তবে এতে একটা অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে, বাবু মুহূর্তের মধ্যে এ ধারণাটা করে যে, জেরিন যেহেতু গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে, মামা নিশ্চয়ই বুঝবেন এর মধ্যে বাবুর জোরাজুরির কোনো ব্যাপার ছিল না। আর হ্যাঁ, বাকিটা সে তো এখন হুবহু যা ঘটেছে খুলে বলবেই।

বলার জন্যে সে মুখ খুলতে যায়, কিন্তু তার আগেই মামা প্রায় গর্জন করে ওঠেন, 'বাবু!'

'মামা... ।'

মামার গর্জন আবার শোনা যায়, 'বাবু!'

'মামা, আমি বলছি আপনাকে, সব বলছি।'

'তুই, তুই আবার কী বলবি! তুই কী বলবি ?' বলতে বলতে মামা বাবুর সামনে এসে দাঁড়ান, ডান হাতটা তোলেন, সজোরে একটা চড় বসিয়ে দেন বাবুর গালে।

'মামা!'

'চুপ।'

'আমি কিচ্ছু করিনি মামা, কিচ্ছু করিনি।'

'কিচ্ছু করিসনি ?'

বাবু সজোরে দুপাশে মাথা নাড়ে।

'আমি কিছু বুঝি না ভেবেছিস ?' আরেকটা চড় নেমে আসে গালে।

'মামা, আপনি ভুল করছেন।'

'আমি ভুল করছি ?'

'মামা, বলেছি তো আমার কোনো দোষ নেই।'

'আচ্ছা, তোর দোষ নেই! ভালো, খুবই ভালো।'

'মামা, আমাকে ঘটনাটা বলতে দেন।'

'শোন।'

'আমাকে ঘটনাটা বলতে দেন মামা, খুলে বলতে দেন।'

'শোন, তুই কাল সকালে এ বাসা থেকে বের হয়ে যাবি।... না, বের হতে হবে না, আমিই তোকে ঘাড় ধরে বের করে দেব।'

'মামা, আপনি আমার কথা শুনবেন না?'

'তোর যা যা আছে সব গুছিয়ে রাখবি। আমি যে ডিসিশন নিই, বদলাই না। আমার পা-ও যদি ধরিস, লাভ হবে না।'

'আপনি বলছেন, আমি বের হয়ে যাব।' বাবু হঠাৎ করেই স্থির হয়ে দাঁড়ায়, দৃঢ় গলায় বলে, 'আপনি অনেক করেছেন আমার জন্যে। এখন বের হয়ে যেতে বলছেন, বের হয়ে যাব। কিন্তু দোষ যে আমার না, এটা আপনাকে জেনে রাখতে হবে।'

'দোষ তোর না। দোষ জেরিনের?'

'জি, উনি এসেই আমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছেন। আমি ভেবেছি আপনি। দরজা খুলেছি, উনি ভেতরে ঢুকে পড়েছেন...।'

মামা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে ওঠেন, 'থাক থাক, আর বলতে হবে না।'

'আমি যা বলেছি, সত্যি বলেছি। একটুও মিথ্যা বলিনি।'

'আহা রে!... জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ভোর না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাক।'

বাবু কিছু বলতে যায়, মামা আঙুল তোলেন ঠোঁটে, 'আর একটা কথাও না।'

মামা বেরিয়ে গেলে বাবু টের পায় শরীর তার আয়ত্তে নেই। নিয়ন্ত্রণহীন শরীর দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে স্থান করে নেয়। বাবু একটু পর টের পায় তার মাথাও কাজ করছে না। এই যে মাথা কাজ করছে না, এই অবস্থাটা স্থায়ী হয় দীর্ঘক্ষণ। বাবু দেখে, একটানা সে কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছে না, সবকিছু বারবারই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তবে এ অবস্থায় সে যা করার করে নেয়। তার জিনিসপত্রের সংখ্যা কম, তবে সেসব কিছুটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। শিথিল পায়ে সেসব গোছাতে গোছাতে কিছুটা সময় যায়। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সে আবার ঘরের মেঝেতে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। টের পায় তার মাথা তখনো ঘুরছে। এখন সে কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে? কী করবে? কিছুই বুঝতে পারছে না সে। একটা মেয়ে, একটা মেয়ের শারীরিক আকাঙ্ক্ষার কারণে তার গুছিয়ে রাখা ভবিষ্যৎ, চিন্তা, স্বপ্ন, পরিকল্পনা সব এলোমেলো হয়ে গেল! সে কিছুই ভাবতে পারছে না, কিছুই না। সব তার মাথার ভেতর জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

সকাল হতে না হতেই মামা এসে ডাক দেন, 'বাবু!'

বাবু মুহূর্তের মধ্যে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ায়।

'বাহ্, একদম তৈরি হয়ে আছিস! গুড, ভেরি গুড।'

বাবু চুপ করে থাকে।

'আয়, আমার পেছন পেছন আয়। তোকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তারপর আমার শান্তি।'

'মামা...।'

'আবার কী হলো?'

'আমার কিছু কথা ছিল।'

'তোর আবার কী কথা!'

'আমি মিথ্যা বলব না। আমার কথাগুলো শুনে আপনার বিশ্বাস করতে হবে।'

'কথা বাড়াস না তো, আয়।... দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি আমি।'

বাবু এবার স্পষ্ট করে মামার দিকে তাকায়। তার ধারণা ছিল, মামাকে দৃঢ় ও কঠিন দেখাবে, মামা দাঁড়িয়ে থাকবেন সোজা ও শক্ত হয়ে। তার চোখেমুখে থাকবে বিরক্তি ও ঘৃণা। কিন্তু সে রকম কিছুই মামার মধ্যে দেখা যায় না। বরং তাকে কেমন অসহায় ও ভাঙাচোরা দেখায়। যেন এক রাতের মধ্যে লোকটা কয়েকটা বছর পার হয়ে এসেছেন। সবকিছুর পরও মামার চেহারা দেখে বাবুর বুকটা হু হু করে ওঠে। আবার এই ভেবে নিজের জন্যেও তার কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে গলার কাছে, সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাকে এই বাড়ি ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রাস্তায় পা রাখতে হচ্ছে। এর জন্যে পুরোপুরি দায়ী তার মামাতো বোন জেরিন। কিন্তু মামা যদি শুধু মন দিয়ে তার কথা শুনতেন, তবে অনেক কিছুই মামার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত।

আরেকবার কি সে মামাকে সবকিছু খুলে বলার চেষ্টা করবে? এই ভেবে সামনে থাকা সে পেছন ফিরে তাকাতেই মামা তার গালে চড় বসিয়ে দেয়, 'কী রে, আবার আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন! রাত ধরে আবার নতুন গল্প তৈরি করেছিস?'

বাবু বোঝে, এখানে আর কিছুই বলার উপায় নেই তার। সুতরাং সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত গেটের দিকে পা বাড়ায়। গেটের কাছে কয়েকটা গাছ। একটু আড়ালমতো। দূর থেকে সবকিছু পরিষ্কার বোঝা যায় না। বাবু গেটের কাছে পৌঁছে গেছে প্রায়। মামা আরো দ্রুত তার কাছে চলে আসেন, 'দাঁড়া।'

বাবু থামবে কি থামবে না মনস্থ করতে করতে থেমে যায়।

'এই যে ধর, এটা নে। সঙ্গে রাখ। কাজে লাগবে।'

একবার ভাবে ফিরবে না সে, মামা কী ধরতে আর সঙ্গে রাখতে বলছেন সেটা তার দেখার বা জানার দরকার নেই, সে গেট খুলে সোজা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কী এক প্রবল কৌতূহল, বাবু পেছনে না তাকিয়ে পারে না, দেখে মামার হাতে একটা খাম, মামা খামটা বাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে রেখেছেন।

জিজ্ঞেস করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে বাবু জিজ্ঞেস করে ফেলে, 'এটা কী ?'

'ধর।'

'এটা কী ?'

'এর মধ্যে দশ হাজার টাকা আছে। সাবধানে খরচ করতে পারলে বেশ কিছুদিন চালিয়ে নিতে পারবি।'

বাবু কতক্ষণ হাঁ হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, 'আপনার টাকা আমি কেন নেব ?'

'রাখ, দরকার পড়বে তোর।' মামা বলেন, 'তুই কি ভেবেছিস, আমি কিছু বুঝিনি ?' বাবু দেখে, মামার চোখে কান্নার মতো হাসি।

বাবু কী করবে বুঝতে পারে না।

মামা খামটা তার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দেন, 'সাবধান কিন্তু। দুনিয়া বড়ই কঠিন জায়গা। দেখলিই তো। তবে একটা সুবিধা তোর হলো। আমি একদম খালি হাতে আরম্ভ করে সেল্‌ফ্‌ মেড ম্যান হয়েছি, তুই আরম্ভ করতে যাচ্ছিস হাজার দশেক টাকা নিয়ে।'

'মামা...।' বাবুর চোখ ছলছল করে ওঠে।

'এই, কাঁদবি না।'

'মামা...।'

'আরে বাবা, সবই বুঝেছি আমি, সবই।'

তাহলে আপনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন কেন!'

'কারণ এই বাড়িতে তোর আর থাকা হবে না।'

'কিন্তু মামা..।'

মামা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে আরম্ভ করেন, 'যা, যা তুই, সামনে কত কী আছে দেখার আর করার। যা।'

বাবু গেটের কাছে গিয়েও একবার পেছন ফেরে, তাকায়, অজান্তে তখনই চোখ যায় দোতলার বারান্দায়, দেখে জেরিন অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। না, দৃশ্যটা এমন মধুমাখা নয় যে, প্রেমিক বিদায় নিচ্ছে আর প্রেমিকা বিষণ্ন মুখে বিদায় দিচ্ছে। জেরিন এমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। বাবুকে সে অবশ্য দেখে এক পলক। হাত মুখের কাছে এনে হাই তোলে, বেশ কিছুটা সময় নিয়ে আড়মোড়া ভাঙে, তার ভাবটা এ রকম— সামনের রাস্তায় যে ছেলেটা ব্যাগ হাতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে সে চেনে না, দেখেইনি কোনো দিন, অচেনা আরো আট-দশটা মানুষের সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই। বাবু নিজের ভেতর জেরিনের প্রতি এক প্রবল ঘৃণা অনুভব করে। এগোতে

এগোতে সে টের পায়, জেরিনের প্রতি তার যে ঘৃণা, সেটা শুধু জেরিনের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকছে না, সেটা ধীরে ধীরে সব মেয়ের প্রতি ছড়িয়ে পড়ছে। কেন এমন হয়, সে সেটা বুঝতে পারে না। কিন্তু সে বোঝে, এর পর থেকে মেয়েদের সে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। এর সঙ্গে থাকবে প্রতিশোধের ইচ্ছে। এই যে এখন যেমন জেরিনের ওপর একটা প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে তার ভেতরে কাজ করছে; তবে হ্যাঁ, এও ঠিক, সে জানে এখন সে কোনো প্রতিশোধই জেরিনের ওপর নিতে পারবে না। পরে কি পারবে ? জেরিন কিংবা অন্য কোনো মেয়ের ওপর ? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু জেরিন কেন, তার মনে হচ্ছে, প্রতিশোধ একটা নিতে পারলেই হলো, সেটা যে-কোনো মেয়ের ওপরই হোক না কেন!

অপেক্ষা করতে করতে দলের আর সবাই বিরক্ত হয়ে পড়েছে। বিরক্ত হয়নি বাবু। তার অপেক্ষা করতে বিরক্তি নেই। তার আসলে এখন কোনো কিছুতেই বিরক্তি নেই। এই যে জীবন তার এমন, এই জীবনে সে খুশি, খুব খুশি, সন্তুষ্ট। এই সন্তুষ্টি না থাকলে নানা কারণেই হয়তো তার বিরক্তি জন্মাত। কিন্তু সন্তুষ্টি, আনন্দ আর তৃপ্তি ছাড়া সে কোনো বিরক্তিই অনুভব করে না।

'ওস্তাদ।' মৃদু গলায় জনি বলে।

বাবু তার দিকে ফিরে তাকায়। জনি তাদের দলের অল্পবয়সী যে কজন আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম। ইসমাইল ভাই কিছুদিন হলো এদিকে নজর দিয়েছেন। বয়স বেশ কম, এমন ছেলেদের রিক্রুট করেছেন। এদের নিয়ে দুই সুবিধা। এক. চেহারায় কিশোরসুলভ সারল্য আছে বলে এদের কেউ সন্দেহ করে না। দুই. বয়স কম বলে এরা আগ-পিছ ভাবে না। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পায়। নিজেদের হিরো ভাবতে আরম্ভ করে। এদের দিয়ে তাই অনেক কিছু করিয়ে নেয়া যায়।

জনির জন্যে বাবুর মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। ও কোনো দুঃখে, নাকি ইচ্ছে করেই এসবের সঙ্গে জড়িয়েছে, কে জানে! বাবু কখনো জানতে চায়নি, এসব জানতে না চাওয়াই ভালো। কিন্তু খারাপ লাগা এ কারণে যে, এ বয়সেই এ ছেলে ভয়ঙ্কর সব অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। চাঁদাবাজি, ডান্ডাবাজি ছাড়াও দু-একটা কিলিং মিশনে ছিল। এর পরে কী করবে সে ? আরো বড় মাস্তান হবে, ধরা পড়বে, না প্রতিপক্ষের গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে ? বাবুর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় জনির সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে। বলবে, আমার নাহয় উপায় ছিল না, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী ? তবে নিজেকে সামলে রাখে বাবু। সে কেন বলতে যাবে! যে যার জীবন বেছে নেয় কিংবা বেছে নিতে বাধ্য হয়। বয়স যতই কম হোক না কেন, যার জীবন তার, সে জীবন সে-ই ভালো বুঝবে।

বাবু জনির ডাকের উত্তর না দিয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'পাখি বড়ই ঝামেলা করতাছে।'

'পাখি! পাখি মাইনে!' জনি অবাক না-হলেও অবাক হওয়ার ভান করে, 'সেই ব্যাটা?'

'পাখি' মানে সেই শিকার? যাকে ফেলার জন্যে তারা অ্যামবুশ পেতে আছে? বাবু সামান্য মাথা ঝাঁকায়, 'হুঁ।'

'ব্যাটায় টের পাইল নাকি...।'

'টের পাইব ক্যামনে?'

'আমার সন্দ হইতাছে। তার আসনের টাইম বহু আগেই পার হইয়া গেছে।... কিছু বুঝতাছেন ওস্তাদ?'

কিছু একটা ব্যাপার সে বুঝেছে, সন্দেহও হচ্ছে। তবে সরাসরি অভিযুক্ত করার মতো কোনো প্রমাণ তার হাতে নেই। এখন জনির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে তার ইচ্ছাও করছে না। সে তাই বলে, 'যা, তুই তোর জায়গায় যা।'

'ওইখানে রতন ভাইয়ে নোংরা নোংরা কথা কয়। বহুত বজ্জাত।'

'অই, তুই না শুনলেই পারস।'

'না শুইনা কি পারা যায়। ওই যে দর্জির দোকানের লগে একটা বাড়ি আছে না, বাইবোনে থাহে?'

'হুঁ।'

'বড় ভাইয়ে ছবি আঁকে আর ছোট বইনে গান গায়।'

'অই, এত কথা কইতাছস ক্যান!'

'রতন ভাইয়া ওই মাইটারে নিয়া নোংরা নোংরা কতা কইতাছেন।'

'কইক। তার ইচ্ছা।'

'মাইয়াটা খুব ভদ্র, আর যা সোন্দর!'

বাবু কঠিন চোখ তুলে জনির দিকে তাকায়। তার চাউনিতে ভয় পায় না, এমন লোক খুব কমই আছে। জনিও মুহূর্তের মধ্যে নিভে যায়, 'ওস্তাদ, কিছু ভুল করছি?'

'মাইয়াটা ভদ্র এইটা তরে কে কইল?'

'দেইখাই বোঝা যায়। ভদ্র মাইয়া। ভালা মাইয়া।'

'জনি, তরে এমুন একখান থাপ্পড় দিমু!'

জনি আবারও নিভে যায়।

'মাইয়ামানুষ ভদ্র, ভালো— এইসব আর আমার সামনে কইবি না। ঠিক আছে?'

'জি ওস্তাদ।' জনি বলে। বলে সে আবারও তার পুরনো জায়গায় ফিরে যায়।

বাবু বিরক্ত-ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে হাতের পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটা হিমশীতল পিস্তল। স্পেনে তৈরি। অনেক টাকা দিয়ে এটা জোগাড় করতে হয়েছে। স্পেনের অনেক পিস্তল এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু এটা রেয়ার মডেল। মানুষ খুন করার জিনিস যে এত সুন্দর হতে পারে, না দেখলে বোঝা যায় না।

এমন একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর জিনিস কী করে তার হাতে উঠে এসেছে, সে এক লম্বা কাহিনী। অত বড় কাহিনী বাবু এখন আর নিজেও মনে করতে চায় না। তা ছাড়া কাহিনীর প্রথম অংশ তো খুবই গতানুগতিক। মামার বাসা থেকে বের হয়ে আসে সে, না, মামাই তাকে বাসা থেকে বের করে দেন। কয়েক পা এগোনোর পর পেছনে মামার বাড়ি যখন আর দেখা যায় না, বাবু হঠাৎ করেই দু'চোখে শর্ষেফুল দেখতে আরম্ভ করে।

কী করবে এখন সে ?

কোথায় যাবে ?

কোথায় গিয়ে উঠবে ?

তার খাওয়া-পরার কী হবে ?

এ শহরে মাথা গোঁজার ঠাঁই কীভাবে জোগাড় করতে হয়, আর কীভাবে মামার মতো ধীরে ধীরে সেল্‌ফ্‌ মেড ম্যান হয়ে উঠতে হয়, তার কিছুই সে জানে না। জানার বয়সও তার হয়নি। কী করবে সে ? ব্যাগ হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে ? তারপর যেখানে রাত সেখানেই কাত ? এত দুঃখের মধ্যেও বাবুর মুখে হাসি ফোটে।

সন্ধ্যার দিকে একটা মেসে গিয়ে ওঠে। এর আগে সারাটা দিন তার নানা রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তার মোটামুটি বোঝা হয়েছে ঢাকা শহর এক কঠিন ও ভয়ঙ্কর জায়গা। তবে কপাল ভালো, তাকে কোনো বিপদে পড়তে হয়নি, এমনকি উল্লেখ করার মতো কোনো ঝামেলায়ও সে পড়েনি। তবু যা বোঝার সে বুঝেছে। শুধু তার ভয় ছিল সঙ্গের দশ হাজার টাকা নিয়ে। এই টাকা হাতছাড়া হলে তাকে তো ভিক্ষে করে খেতে হবে।

মেসের মালিক তাকে প্রথমে সিট দিতে চান না, 'নাম কী তোমার ?'

বাবু নাম বলে।

'এইখানে কই থাকো ?'

'এখানে থাকি না। এখানে থাকলে আপনার মেসে থাকতে আসব কেন ?'

'আসে আসে। বুঝবা না। কিংবা বুইঝাই আসছ। তা বাড়ি কই ?'

বাবু গ্রামের নাম বলে।

'কোন ডিস্ট্রিক্ট ?'

বাবু তার জেলার নাম বলে।

'ঢাকায় আসনের কারণ ?'

'কলেজে ভর্তি হব। আমাদের ওদিকে কোনো ভালো কলেজ নেই।'

'এই অল্প বয়সে বাবা-মায় একা ছাড়ল ? নাকি পলায়া আসছ ?'

বাবু মেস ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হয়রান। ম্যানেজার বলেন, 'কয় দিন থাকবা মেসে ? পয়সা দিব কে ?'

'প্রতি মাসের পয়সা অ্যাডভান্স নেবেন।' বাবু শান্ত গলায় বলে, 'যখনই দিতে পারব না, তখনই বের করে দেবেন।'

'সেইটা তো দিমুই।' ম্যানেজার নির্বিকার গলায় বলেন, 'থাকো।... বুইঝা থাকবা।'

বাবু মেসে থাকতে আরম্ভ করে।

শুরু হয় তার মেসজীবন। মেসটা বড়, নানা পেশার মানুষের বাস। বাবুর ঘরের সঙ্গী কালিনাথ পোদ্দার। কালিনাথ প্রথমেই বাবুকে বলে দেন, 'শুনো, তুমারে একখান কতা স্পষ্ট কইরা কই। চাকুরি করি, আবার বৈকালে ফুটপাতে হকারিও করি। কিন্তু আমি আসলে বৈরাগী টাইপের মানুষ। যেদিন ডাক পড়ব নিরুদ্দেশ হইমু। আমি চাকুরি আর হকারির কথা কইলাম, হুনলা। এইবার তুমি কে, কী নাম, কী বৃত্তান্ত সাফ সাফ স্পষ্ট কইরা কও। তারপর কিন্তু আমার লগে আর কতা কইতে আসবা না, আমি তো কইমুই না।'

পরে কিন্তু মেস ম্যানেজার তোরাব জমাদ্দার এবং এই কালিনাথ পোদ্দারের সঙ্গে বাবুর সম্পর্ক অত্যন্ত প্রগাঢ় হয়। তবে সে হচ্ছে অন্য গল্প এবং সে গল্প অতীত।

বাবু মেসে থাকতে আরম্ভ করে। কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। কিন্তু সে সময় কলেজে ভর্তি নিয়ে ভাবছে না সে। সে ভাবছে চাকরির কথা। বারবার অবশ্য তার মামার কথা মনে পড়ছে। তা ছাড়া ঢাকা শহরে এ কয়েক মাস থেকে সে নিজেও মানসিকভাবে অনেকটাই বড় হয়েছে। ফলে সে নিজেও বুঝতে পারছে, তার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা, তা দিয়ে চাকরি জোগাড় করা অসম্ভব। সে দিন কয়েক চেষ্টা চালিয়ে বোঝে, শুধু অসম্ভব ব্যাপার নয় এটা, হাস্যকরও বটে। অধিকাংশ অফিসেই সে ঢুকতে পারে না। দু-চারটায় কখনো যদি ঢুকতে পারেও, তার বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সবাই হাসাহাসি আরম্ভ করে দেয়। এক অফিসের এক লোক এমনই বজ্জাত, প্রথমে তাকে খুবই নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী, চাকরি খুঁজতাছ ?'

'জি।'

'কী চাকরি করবা ?'

'জি, যে চাকরি পাই সেইটাই করব। খুব দরকার।'

'খুব দরকার হইলে আমার কাছে একটা আছে।'

বাবু উদগ্রীব হয়ে লোকটার দিকে তাকায়।

'তোমার যে বয়স আর লেখাপড়া, এর চায়া ভালো চাকরি আর পাইবা না। এখন ভাইবা বলো।'

'জি, আপনি বলেন কী চাকরি?'

'সংসার গ্রামের বাড়িতে। বহুদূর। যাইতে পারি না। একা একা থাকি। রাইতে ঘুম আসে না। তা তুমি থাকলা আমার লগে। রাইতে আমার পা টিপ্পা দিবা, পা টিপলে, গা টিপলে ঘুম আসব। মাস শেষে তোমারে নাহয় কিছু ধরায় দিমুনে। চাকর-বাকরের মতো থাকলা আর-কি।'

বাবু প্রথমে প্রস্তাবটা বোঝে না। যখন বোঝে তখন একই সঙ্গে দু রকম অনুভূতি হয় তার। অপমানে লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছা করে। আবার এ রকম এক ইচ্ছেও তার হয়— লোকটার ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যা থাকুক কপালে, হাতের কাছে যা পাবে তা নিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঝাঁপিয়েই সে পড়ে।

তবে সেটা বেশ পরের কথা। তখন সে কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম বর্ষের মাঝামাঝি। তার দশ হাজার টাকা শেষ। তার সঙ্গে যে খুচরো কিছু টাকা-পয়সা ছিল, তাও শেষ। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, কালিনাথ পোদ্দার তাকে একটা টিউশনি জোগাড় করে দিয়েছেন। বাবু নিজে কিছু বলেনি, বলতে যায়ওনি। তার অবস্থা দেখে কালিনাথ পোদ্দারই একদিন জিজ্ঞেস করেন, 'হয়েছেটা কী? সমস্যায় আছ বইলা মনে হইতাছে?'

বাবু উত্তর দেয় না। তবে ভাবগতিক, চেহারা দেখে তার অসহায়ত্ব সহজেই বোঝা যায়।

'ঝামেলায় থাকলে আমারে বললেও তো পার। কিছু করতে না পারি, শুনতে তো পারি, নাকি সেইটাও পারি না?'

'আপনিই তো কথা কম বলতে বলেছেন।'

'আশ্চর্য কতা! তাই বইলা বোবা হইয়া থাকবা নাকি! বলো, শুনি।'

বাবু বলে এবং কালিনাথ পোদ্দার কয়েক দিন পর টিউশনিটা জোগাড় করে দেন। তার আন্তরিকতায় বাবু মুগ্ধ হয়ে যায়। টিউশনিটা অবশ্য ভালো না, এটা কয়েক দিন পরই টের পাওয়া যায়। দুটো বাচ্চাকে পড়াতে হয়, বিচ্ছু টাইপের। অসহ্য! তবে হ্যাঁ, বেশি অসহ্য লাগে কিন্তু বিচ্ছু দুটোর বাবা-মা'র ব্যবহার। বাবুকে তারা বাড়ির কাজের লোকের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না। মাস শেষে বেতন নেয়ার সময় দেখা যায় আরেক ফ্যাকড়া। যে টাকা দেয়ার কথা, তার চেয়ে তিনশ টাকা কম দিয়ে বলেন, 'তুমি তো ঠিকমতো পড়াইতে পার না। দেখো, এইটায় তোমার পোষায় নাকি?'

পরিশ্রম হিসাব করলে আর ব্যবহারের কথা ভাবলে পোষানোর কথা নয়। কিন্তু বাবুর তখন 'না' বলার ক্ষমতা নেই। তার যে অবস্থা, টিউশনিটা তাকে চালিয়ে যেতে হয়। তাই বলে কালিনাথ পোদ্দারের ওপর থেকেও তার শ্রদ্ধা কিন্তু কমে না। এই যে টিউশনিটা ভালো না, তার জন্য তো তিনি দায়ী না। বরং বাইরে বাইরে নীরস স্বভাবের এই মানুষটা বাবুর দুরবস্থা অনুভব করেছেন। তার প্রতি তাই বাবুর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তবে এও ঠিক, তার দিন চলছে না। মেসে কিছু বাকিও পড়েছে। শেষমেশ কিন্তু মেস ম্যানেজার তোরাব জমাদ্দার তাকে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। বাকির ব্যাপারে একবার শুধু বলেছেন, 'চেষ্টা করবা বাকি যেন না পড়ে। বাড়লে একসময় এমন হইব, আর শোধ করতে পারবা না। তখন আমারও কিছু করার থাকব না। আমি তো আর এই মেসের মালিক না। ম্যানেজার।'

এ রকম যখন অবস্থা বাবুর, তখনকার এক দিনের ঘটনা। সেদিন বাবুর মন ভালো নেই। তখন মন ভালো তার অনেক সময়ই থাকে না। সেদিন বেশি খারাপ। টিউশনি থেকে ফিরে এসেছে মুখ কালো করে। সেখানে তার ছাত্রের বাবা প্রায় অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, অথচ তার দোষ নেই কোনো। মেসে ফিরেও ঘটেছে আরেক ঘটনা। বেখেয়ালে একজনের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে, বেশ জোরেই লেগেছে। যার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে, সে মেসের কেউ হলে চিন্তার কিছু ছিল না। যার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে সে বড়সড় কোনো মাস্তান গ্রুপের সদস্য। প্রবল প্রতাপ। সব দিক ম্যানেজ করে তারা বিশাল এলাকা জুড়ে মাস্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ মেসে প্রায়ই আসে। পেছনের দিকে তাদের জন্যে দু-তিনটা ঘর আছে। ওই দলের কেউ কেউ কখনো এসে থাকে, কখনো মদের আড্ডা বসায়, মাঝে মাঝে মেয়েটেয়েও আসে, ফুর্তি-টুর্তিও হয়। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। কারো যদি এই পরিবেশ পছন্দ না হয়, তবে সে এখান থেকে চলে যাবে, এই হচ্ছে নিয়ম। ম্যানেজার তোরাব প্রায়ই বাবুকে বলেন, 'তোমাকে প্রথমেই বলছিলাম, বুইঝা থাকবা।... বুঝতেছ তো?'

সে যা-ই হোক, মেসের বাসিন্দাদের সঙ্গে এদের কখনো খটমট লাগে না। এরা যখন আসে, নিজেদের মতো আসে, যায়। মেসের বাসিন্দাদের যেন এরা মানুষই মনে করে না। কিন্তু সে সন্ধ্যায় ঘটনা ঘটে অন্যরকম।

বাবুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে ওদের একজনের এবং ছেলে মুখ বিকৃত করে বলে, 'আবে অই খানকির পো, চক্ষে দেখস না? চক্ষু দুইটা পকেটে থুইয়া আন্ধা হইয়া হাঁটতাছস!'

সে অবশ্য এমনিতেই কখনো কিছু করে না, বলেও না। এদের সঙ্গে কিছু করা যায়ও না, সে জানে। কিন্তু সেদিন তার মেজাজ এমনিতেই খারাপ। তাই সে গালি শুনে, একটু আগেও গালি শুনে এসেছে সে, কঠিন চোখ তুলে ছেলেটার দিকে তাকায়। এতটাই, যেন মাস্তানটাকে সে ভস্ম করে দেবে। এই যে ধাক্কা লেগেছে,

এই দোষ তো তার একার নয়। আর নাহয় লেগেছেই একটা থাক্কা বেখেয়ালে, তার জন্যে এ রকম গালি!

তার তাকানো দেখে মাস্তান ছেলেটা অবাক হয়ে যায়। এভাবে এ মেসের কেউ তার দিকে তাকাবে, এ তার ধারণায়ও ছিল না। ফলে ধাতস্থ হতে সময় লাগে তার। তার পরই সে বাবুকে ধাক্কাতে আরম্ভ করে, 'আরে অই, আমারে দেখি মাপতাছস তুই! অ্যাঁ, আমারে মাপতাছস!'

ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাবুকে সে এক কোণায় নিয়ে যায়, 'মারানির পো, জবান বন্ধ ক্যান! কতা ক। চক্ষে আগুন, মুখে কতা নাই, এইটা কী ব্যাপার!... আরে হারামজাদা, আগুন দেখাস, তর চক্ষু আমি গাইলা দিমু।' বলতে বলতে সে ছেলেটা পকেটে হাত দেয়, পকেটে ভাঁজ করা চাকু না ক্ষুর কে জানে, তবে সেটা বের হওয়ার আগেই তোরাব ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কাচুমাচু হয়ে ছেলেটার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ান, 'ভাইজান, এ বুঝতে পারে নাই, নাদান পোলা, এরে আমি মেস থেইকা বাইর কইরা দিমু। খামাখা মাছি মাইরা হাত গন্ধ করবেন? আপনার হইয়া আমিই নাহয় দুই থাপ্পড় লাগায়া দিমু। ঠিক আছে ভাইজান?'

তখনকার মতো ব্যাপারটার এক ধরনের নিষ্পত্তি ঘটে বটে, কিন্তু সেই মাস্তান ছেলেটা মেস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শীতল চোখে বলে, 'আজগা তর খবর আছে।'

ততক্ষণে চোখের কাঠিন্য দূর হয়েছে বাবুর। সেখানে এসে ভর করেছে ভয়। সে বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকায়। কাজটা সে খুবই ভুল করে ফেলেছে, হোক রাগের মাথায়, তা সে বুঝতে পারছে। তোরাব জিভটিভ কেটে অস্থির, 'তোমার কি মাথা ঠিক নাই? তুমি এইটা কী করলা!'

কালিনাথ পোদ্দারসহ আর যারা সেখানে তখন ছিল বা হইচই শুনে এসে হাজির হয়েছে, তাদেরও এক কথা, বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

বাবু অবশ্য একটা কথাও বলছে না। সে টের পাচ্ছে তার ভেতরটা কাঁপছে। একটু পর সেটা বাইরে বেরিয়ে আসবে। এই কাঁপুনি বন্ধ করার কোনো উপায় তার জানা নেই। সে ঠিক করে, কোথায় যাবে সে জানে না, এই এখনই মেস ছেড়ে পালাবে। অন্য সবাই বলছে, পালাতে হবে তাকে, এক্ষণি পালাতে হবে। কালিনাথ পোদ্দার হিন্দুমানুষ, সংখ্যালঘু হলে যা হয়, ভীতু মানুষ, তারও ওই একই মত, বাবু মেস ছেড়ে পালাক। তবে তোরাব জমাদ্দারের মত অন্য। তিনি স্পষ্ট গলায় জানান, 'বাবুর কোনোই ভয় নাই, কারণ এ ঘটনা আর বাড়ব না।'

'কেন?'

তোরাবের মুখ থেকে জানা যায়, আজ এই এলাকার মাস্তানদের বিশেষ দিন। আজ তাদের কাজল ভাই আসবে। এই কাজলকে সবাই মুদি কাজল বলে। কারণ

তার বাবার একটা মুদিদোকান ছিল এবং সে সেখানে কিছুদিন কাজ করেছিল। কাজল বিখ্যাত হয়েছে, অঢেল ক্ষমতা ও অর্থের মালিক হয়েছে, কিন্তু নামের আগে থেকে 'মুদি' শব্দটা ওঠাতে পারেনি। তবে হ্যাঁ, সে চেষ্টা করেছে। এ নিয়ে তার চাপা দুঃখও অনেক।

কথা আছে কাজল ভাই আজ আসবে এই মেসে। এ ধরনের ছোটখাটো জায়গায় সে কখনো আসে না। তার চলাফেরা অনেক উঁচুতে। সে চল্লিশ লাখ টাকা দামের গাড়িতে চলাফেরা করে, ফাইভ স্টার হোটেলে তাকে দেখা যায়, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তার খানাপিনা হয়, ফুসুরফাসুর, কত কী শলাপরামর্শ, গালগল্প হয়। সেই কাজল ভাই আজ আসবে, কারণ এ এলাকায় তার অনুগতরা অনেক দিন ধরে বলছে। তারা আরো ভালো জায়গার ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু কাজল ভাই বলেছে সে এলাকায় আসবে, এখানকার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে আড্ডা দেবে। তোরাব বলে, 'এইটা হইতেছে পলিটিক্স্, এগো লগে আইসা আড্ডা দিব আর এরা ভাবব— আহা রে, কাজল ভাই আমাগো লগে বইসা গল্প করতাছে, মদ খাইতাছে...।'

'এর জন্যে বাবুর বিপদ কেমনে কাটল?' কালিনাথ পোদ্দার জানতে চান।

'কাটল। কারণ, একটু পর তারা এতই ব্যস্ত হইয়া পড়ব, বাবুর কথা তাগো মনেই থাকব না। আর এইটা হইতেছে ছোট ঘটনা। আজ তাদের বড় ঘটনা ঘটতাছে।... বাবু যাও, তুমি ঘরে যাও। কালিবাবু, আপনের যদি কথা বলার ইচ্ছা থাকে, আসেন চা খাই আর গল্প করি।... বাবু, তুমি যাও। ভয় নাই।'

ঘণ্টাখানেক পর কিন্তু তোরাব জমাদ্দারের কথা ভুল প্রমাণিত হয়। বাবুর ভয় তখন কাটলেও অস্বস্তি পুরো কাটেনি। সে গম্ভীর মুখে বিছানায় বসে আছে, কালিনাথ পোদ্দারের সঙ্গে কথা বলছে। এ সময় বিকট শব্দে দরজা খুলে যায়। কালিনাথ পোদ্দার তখন বলছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই খুব ভালো একটা টিউশনি তিনি বাবুকে জোগাড় করে দেবেন— আওয়াজে তার কথা থেমে যায় এবং তিনি লাফিয়ে ওঠেন। বাবু নড়ারও সময় পায় না। তিনটা ছেলের একজন দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে, বাকি দুজন এসে বাবুর চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। নিরীহ মানুষ হলে কী হবে, কালিনাথ তার পরও লাফিয়ে ওঠেন, লাফিয়ে উঠে বাধা দিতে আসেন এবং এক ছেলের থাপ্পড় খেয়ে মাথা ঘুরে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়েন।

ঘরের বাইরে এসে বাবু ওই অবস্থাতেও দেখে, কাউন্টারে বসে আছেন তোরাব। তার চোখেমুখে আতঙ্ক ও বিস্ময়। তাকে মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। কোনো দিকেই তাকাচ্ছেন না। কাউন্টারের ওপর তোরাবের সামনে পিস্তল রেখে যে ছেলেটা আপন-মনে সিগারেট খাচ্ছে, তার দিকেও না। তবে বাবুর দিকে শেষ মুহূর্তে তাকায় তোরাব। তার দু চোখ বড় হয়ে যায়, তাকে বড় অসহায় দেখায়। আর বাবুরে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় মেসের পেছন দিকের ঘরে। সেখানে বেশ কয়েকজনের মধ্যমণি হয়ে কাজল ভাই, অর্থাৎ মুদি কাজল বসে আছে। কাজল ভাই বাবুর দিকে

তাকিয়ে মধুর হাসি হাসে। তার জানা ছিল না আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অল্পবয়সী ছেলেটার হাতে তার মৃত্যু ঘটবে।

বাবুকে প্রায় ছুড়ে দেয়া হলো কাজল ভাইয়ের সামনে। কাজল ভাই তার জুতোটা তুলে দেয় বাবুর মুখে, 'কী রে, তুই আমার খোকইন্যার লগে এমন করছস ক্যান ? এত সাহস তুই কই পাইছস ?'

বাবু থরথর করে কাঁপে, তার বারবার শুধু মনে হয়, কেন, কেন সে খোকন নামের ওই ছেলের দিকে গরম চোখে তাকিয়েছিল ? এখন কী করবে সে, কাজল ভাইয়ের দু পা জাড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইবে ? কিন্তু সেটা কি সে পারবে ? নাকি উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, তার একটা কারণে মেজাজ গরম ছিল, সে কারণেই ওই ঘটনাটা ঘটেছে, সে ভুল করেছে, ওই ভুলের জন্যে সে ক্ষমা চাইছে ?

কাজল ভাই তার লোকজনের দিকে তাকায়, জানতে চায় কারো সাহস বেশি বাড়লে কী করতে হয়। একেক জন একেক কথা বলে। কোনোটাই কাজল ভাইয়ের পছন্দ হয় না। কাজল ভাই হাত তুলে একজনকে ডাকে, মৃদু গলায় কিছু বলে।

'নে, আরম্ভ কর। দেখি।' কাজল ভাই বলে।

কাজল ভাইয়ের কথা শেষ হয়, আর সেই ছেলে তার নাম খলিল, সে কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করে বাবুর মাথায় ঠেকায়, 'খানকির পো, এইটা দেখছস, এইটা পুরা হান্দায়া দিমু। তারপর কী করুম জানস ? এই কান দিয়া গুলি করুম, ওই কান দিয়া বাইর হইব।'

খলিল পিস্তল দিয়ে ছোট একটা বাড়ি দেয় তার মাথায়। আঘাতটা টের পায় না বাবু। সে টের পায় ঘরের সবার হাসি। কাজল ভাইয়ের দিকে চোখ যায় তার। অতি উজ্জ্বল চোখে কাজল তার দিকে তাকিয়ে, তার মুখ চকচক করছে, জীবনে যেন এত আনন্দের দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। কাজলের এই তাকিয়ে থাকাই বাবুকে বদলে দেয়। এই বদলে যাওয়া, পরে বহুবার চেষ্টা করেও বিস্তারিত মনে করতে পারেনি সে। ওই স্মৃতি কেন তার আবছা হয়ে গেছে, সে বুঝতে পারে না। আরো বুঝতে পারে না ওই সময় অবিশ্বাস্য এক সাহস তার ওপর কীভাবে ভর করেছিল।

খলিল কুৎসিত হাসি হাসতে থাকে। খলিলের এক হাতে পিস্তল। সেই পিস্তলটাই কেড়ে নেয় বাবু। কীভাবে নেয়, তা সে জানে না। কীভাবে নেয়, তা তার মনে নেই। তার শুধু মনে আছে, সে একটা মোচড় দেয়, খলিল অশ্লীল একটা গালি দিয়ে বলে, 'বাইন মাছের মতো মোচড়াইতাছস ক্যান!' কিন্তু এ পর্যন্তই, পরমুহূর্তেই সে দেখে তার পিস্তল বাবুর হাতে। খলিল মুহূর্তের মধ্যে ভ্যাবচেকা খেয়ে যায়, কী করবে বুঝে ওঠার জন্যে যেটুকু সময় তার দরকার, বাবু সেটুকু সময়ের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলে। পিস্তল কীভাবে চালাতে হয়, পরিষ্কার ধারণা ছিল না তার। কিন্তু নানা ধরনের বইয়ের মধ্যে বেশ কিছু 'মাসুদ রানা' সিরিজের বইও সে পড়েছে।

সেই অনুমানের ওপর সে প্রায় পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালায় এবং খলিল দু চোখে প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে ছিটকে পড়ে, পড়ে থাকে।

ওদিকে মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়ায় কাজল ভাই। তাকে পুরো উঠতে দেয় না বাবু, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজলের ওপর, তারপর গুলি চালায়। এতটাই নিশ্চিত, কাজলের দিকে ফিরে তাকায় না সে। সে ফিরে তাকায় ঘরের অন্যান্যের দিকে।

এমন একটা ঘটনার জন্যে কারো বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না। ফলে বাধা দেয়ার চিন্তা কারো মাথায়ই আসেনি। আর পুরো ব্যাপারটাই এত আকস্মিক ও অবাক করা, তারা সবাই প্রায় স্তম্ভিত, বিস্মিত। যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। ওই ঘোরে থেকে তারা শুধু বিমূঢ় চোখে কাজল ভাই, খলিল আর বাবুর দিকে তাকাতে পারছে, আর কিছু পারছে না। বাবু বুঝতে পারে এ অবস্থা অবশ্যই তাদের থাকবে না, এই এখনই তারা সক্রিয় হয়ে উঠবে, বাবু এই সময়টাই কাজে লাগায়। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো কাজ করে বাবুর মাথা, সে দ্রুততম চিতার মতো দরজার দিকে এগোয়, দুজন ঘোর কাটিয়ে বাধা দিতে আসে। কিন্তু বাবুর শরীরে তখন অসুর ভর করেছে, তার প্রচণ্ড ধাক্কায় দুজন দুদিকে ছিটকে পড়ে। পেছনে একটা গুলির শব্দ হয়, তবে সেটা তাকে স্পর্শ করে না, সে অক্ষত অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে আসে কাউন্টারের কাছাকাছি। ওখানকার দৃশ্যটা অদ্ভুত। তোরাব জমাদ্দার না কালিনাথ পোদ্দার, কার মুখ বেশি হাঁ হয়ে আছে, তা অনুমান করা কঠিন। যে ছেলেটা পিস্তল কাউন্টারের ওপর রেখে দাঁড়িয়েছিল, সে কী ঘটেছে অনুমান না করে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একবার সে এগোতে চাইছে, আরেকবার ভাবছে ওখানেই তার থাকা উচিত। বাবুকে পিস্তল হাতে ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে পিস্তল তোলে। তবে একটু সময় নেয়, এই ফাঁকে খেয়াল করে বাবু, তোরাব আর কালিনাথ দুজনের মুখে একই সঙ্গে ভয় ও স্বস্তির হাসি ফুটে উঠেছে। কাউন্টারের সামনে থেকে ছেলেটা পিস্তল তোলে আর তোরাব তখনই ছেলেটারে মাথা লক্ষ্য করে ঘুষি মারেন। সে ঘুষিতে ছেলেটার কিছু হয় না, তবে ছোট একটা ভুল করে সে। এসব সময়ে ছোট ভুলই যথেষ্ট। সে বাবুর দিক থেকে পিস্তল সরিয়ে নিয়ে তোরাবকে গুলি করে। ওটুকু সময় বাবুর জন্যে অনেক সময় হয়ে যায়। সে গুলি চালায়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ছেলেটা এবার তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি বের হয় না, আর কালিনাথ পোদ্দার তখনই ছেলেটাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে থাকেন, 'বাবু, পালা তুই, পালা বাবু।' এত দিন তুমি করে বলা বাবু হঠাৎ কখন কালিনাথের কাছে অতি আপনজনের মতো তুই হয়ে গেছে, বলতেও পারবেন না। তবে অত কিছু ভাবার মতো সময় তখন নেই বাবুর। পেছনে পায়ের শব্দ, এদিকে কালিনাথও বেশিক্ষণ এ ছেলেকে আটকে রাখতে পারবে না। বাবু আবার দ্রুততম চিতা হয়ে যায়। কাউন্টার পেরিয়ে যাওয়ার সময় সে শুধু

একবার কালিনাথ পোদ্দার, আরেকবার রক্তাক্ত তোরাব জমাদ্দারের দিকে তাকায়। তারপর বেরিয়ে দ্রুত, আরো দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করে।

তার পরের দুটো দিনের কথা তার প্রায় কিছুই মনে নেই। পিস্তলটা সঙ্গে রাখার সাহস হয়নি। দৌড়ে পালাতে পালাতে সেটা সে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল অন্ধকারে, এটা মনে আছে, আর মনে আছে ভয়াবহ এক ভীতিকর অবস্থার কথা। কোথাও তার থাকার ব্যবস্থা নেই, তার পকেটে সামান্য কয়েকটা টাকা। সে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে, তাকেই মনে হচ্ছে এ নিশ্চয় কাজলের লোক, এখনই গুলি করে তার পেট ফুটো করে দেবে। আর সবকিছুর কথা যদি ভুলেও যায় সে, প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ভয়ঙ্কর দুটো দিনের কথা সে কখনো ভুলবে না। শরীর পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে অথচ ভয় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। তার খাওয়ার ঠিক নেই, তার বসার ঠিক নেই, তার শোয়ার ঠিক নেই। তবে সবকিছুরই শেষ আছে। বাবুরও এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাড়িত অবস্থায় দ্বিতীয় দিন রাত দশটা-সাড়ে দশটার দিকে সে ফুটপাথ ধরে মুখ নিচু করে অনির্দিষ্ট গন্তব্যে এগোচ্ছিল, ঠিক তখনই একটা কালো রঙের মাইক্রোবাস ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ায়। বাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজন নেমে এসে পিস্তল ধরে, মাথায়, পিঠে। বাবুকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায় অজানার উদ্দেশে।

স্বাতী কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকে। একবার শুধু স্বাতীর দিকে তাকায় বাবু। স্বাতীর তাকানোর মধ্যে কী আছে, সে বুঝতে পারে না। এমন নির্মল স্বচ্ছ চোখে কখনো কোনো মেয়েকে তাকাতে দেখেছে বলে মনে পড়ে না তার। তবু অস্বস্তি লাগতে আরম্ভ করে। কোনো মেয়ে, বিশেষ করে এই মেয়েটি, তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকবে, এটা ক্রমশই তার ভেতর অস্বস্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই মেয়ে, এই মেয়েকেই কিছুদিন আগে তারা...! নাহ্, ওই ব্যাপারটা একদমই ভাবতে চায় না বাবু। মনে পড়লেই লজ্জায়, দ্বিধায়, সংকোচে সে সংকুচিত থেকে আরো সংকুচিত হয়ে যায়। অথচ মেয়েটা কেমন যেন নির্বিকার, সেই প্রথম থেকেই নির্বিকার। আর মেয়েটির এই নির্বিকারত্বই বাবুকে সুস্থির হতে দেয় না।

স্বাতীর মুখে মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তার দিকে তাকিয়ে নেই বাবু, কিন্তু সে বুঝতে পারে স্বাতীর মুখে হাসি। সে চোখ তোলে, দেখে সত্যি তাই। তাকে চোখ তুলতে দেখে স্বাতীর হাসিটা আরেকটু বড় হয়। সে জিজ্ঞেস করে, 'এখন নিশ্চয়ই আপনার জানতে ইচ্ছে করছে, এমন একটা কাহিনী শুনে আমি কেন হাসছি?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবু বলে, 'এমন হতে পারে, আমার কাহিনীর সঙ্গে আপনার হাসির কোনো সম্পর্কই নেই।'

স্বাতীর হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে যায়, 'আপনি বুদ্ধিমান ছেলে বাবু। প্রথম প্রথম আপনাকে দেখে যতটা বুদ্ধিমান মনে হয়েছিল, এখন দেখছি আপনি তার চেয়েও বুদ্ধিমান।' স্বাতীর মুখে আবার এক টুকরো হাসি ফোটে, তবে সে হাসি ম্লান, 'অথচ আপনার মতো ছেলে...।'

স্বাতী কথা শেষ না করে চুপ করে যায়।

বাবু টের পায় না কখন তার মাথা নিচু হয়ে গেছে। সে মৃদু গলায় বলে, 'আমি তো প্রায় সবকিছুই বলেছি আপনাকে...।'

'প্রায় সবকিছু বলা মানে সবকিছু বলেননি। কিছু লুকিয়ে রেখেছেন।'

'না, লুকিয়ে রাখিনি। হয়তো ভুলে গেছি পুরো। কিংবা পুরো না ভুললেও বলার সময় মনে পড়েনি। অথবা ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।... আপনি হাসছিলেন কেন?'

স্বাতী দুপাশে মাথা নাড়ে, 'না, এমনি।'

'এমনি কেউ হাসে না।'

'তেমন কিছু না।'

'বলবেন না, বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ, বলব না। কারণ ওটা এখন বলার মতো কিছু না। আমি বরং অন্য কথা বলি।'

'জি।'

'আপনার মেস ম্যানেজার তোরাব জমাদ্দারের খবর জানেন?'

'উনি তখনই মারা গিয়েছিলেন। স্পট ডেড যাকে বলে। পরে আমি কালিনাথ চাচার মুখ থেকে জানতে পারি।'

'আর কালিনাথ বাবুর কী অবস্থা?'

'উনিও গুলি খেয়েছিলেন। পঙ্গু হয়ে গেলেন। চাকরিটাও গেল।'

'বাহ্, কী চমৎকার!'

'এই টিটকারি মারার অধিকার অবশ্যই আপনার আছে। বিশ্বাস করা কঠিন জানি, তবু বলছি শুনুন, আমি কালি চাচাকে গ্রামের বাড়িতে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি, পুকুর কাটিয়েছি। তোরাব চাচার সংসারের সব খরচ আমিই দিই।'

'বাহ্ বাহ্। অনেক করে যাচ্ছেন দেখছি! তা তোরাব সাহেবকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন? কালিবাবুকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন পঙ্গুত্ব থেকে? ফিরিয়ে দিতে পারবেন তোরাব সাহেবের জীবন, কালিবাবুর চাকরি, ওনার পঙ্গুত্বহীন সহজ স্বাভাবিক বেঁচে থাকা?'

'না, পারব না।' বাবু সামান্য হাসে, 'কিন্তু আপনি শুধু আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন বলে আমার ব্যাপারটা বুঝছেন না, মানে আপনার মতো করে ভাবছেন, ব্যাখ্যা করছেন।'

'তা আপনার ব্যাখ্যাটা কী?'

'যখনকার ঘটনা নিয়ে আপনি খোঁচা মারছেন, তখন আমি মাস্তান হইনি, হতে চাইওনি। আমি তখন কলেজের নিরীহ একটা ছেলে, নিতান্তই সাদামাটা, গোবেচারা। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তোরাব আর কালি চাচার ওই অবস্থা হয়েছে, এ জন্যে আমারও খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু এতে তো আমার কোনো দোষ ছিল না। একটু ভেবে দেখুন...।'

'কিন্তু আপনার জন্যেই তো...।'

'হ্যাঁ, আমার জন্যে বা আমার কারণে, কিন্তু এর জন্যে আমি দায়ী না। ওনারা আমাকে ভালোবাসতেন...।'

'এটাই আসল কথা, ওনারা আপনাকে ভালোবাসতেন। ওনাদের ভালোবাসার প্রতিদান আপনি এভাবে দিয়েছেন ? বড় নামকরা মাস্তান হয়ে ?'

'আপনি আমাকে এই অভিযোগে অবশ্যই অভিযুক্ত করতে পারেন।' বাবু দমে যায় না, সে বরং ম্লান হাসে, 'তারা চাইতেন আমার মঙ্গল, তারা চাইতেন আমি পড়াশোনায় আরো ভালো করি...।'

'এসএসসির রেজাল্ট বললেন খুব ভালো ?'

'জি।'

'প্রমাণ কী ? নাকি সিমপ্যাথি তৈরি করার চেষ্টা করলেন, খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, এসএসসিতে দারুণ রেজাল্ট করেছেন...!'

'আমি মিথ্যে বলি না।'

'মিথ্যে বলেন না ?'

'না।'

'মিথ্যে সবাই বলে। কম-বেশি। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে।... প্রমাণ দেখাতে পারবেন এসএসসির রেজাল্টের ?'

'কীভাবে দেখাব ? ওসব কাগজপত্র কিছু আছে নাকি ? রেজাল্টের পর একবার গ্রামের বাড়ি যেতে হয়েছিল মার্কশিট, সার্টিফিকেট এসব তোলার জন্যে। আবার গেলে অবশ্য ডুপ্লিকেট তোলা যায়। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই।... তবে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা মনে আছে।... কিছু কিছু ব্যাপার কেন যেন মনে থেকে যায়।'

'নম্বরটা লিখে দিয়ে যাবেন।'

'জি।'

'এখন পুরনো প্রসঙ্গে যাই। তোরাব সাহেব আর কালিবাবু চাইতেন আপনি জীবনে বড় হন। তা ঠিক, বড় তো আপনি হয়েছেনই, খুব বড়।'

'জি, হয়েছি।' বাবু চোখ তোলে, চোখ তুলে ঠাণ্ডা গলায় বলে।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে বড় মাস্তান হয়েছেন বলে আপনার বড়ই অহঙ্কার।' স্বাতীকে বাবুর শীতল গলা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না, বিব্রত করে না, 'খুবই আনন্দ আপনার...।'

'আমার মনে হয়েছিল আপনার অনেক বুদ্ধি।'

'আপনার মনে হওয়া না-হওয়ায় কিছু যায়-আসে না। আমার বুদ্ধি সত্যি কম নয়।'

'তাহলে আমাকে খোঁচা না মেরে আমার প্রতি আপনার সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত ছিল।'

'কেন ?'

'কারণ, আপনার অনুমান করা উচিত ছিল আমার মাস্তানই হওয়ার কথা, আর কিছু নয়। আমার সামনে তখন ওই একটা পথই খোলা ছিল।'

'জি না, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।'

'তাহলে কী করার ছিল আমার ?'

'তা আমি বলতে পারব না। আমি ওই পরিস্থিতিতে পড়িনি। কিন্তু আমি মনে করি মানুষের সব সময়ই অন্য কিছু করার সুযোগ থাকে।'

'ওটা বইয়ের কথা। ওটা যারা বিপদে পড়েনি বা জীবনে কঠিনতম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি, তাদের তত্ত্বকথা।'

'আপনি সেটা বলতেই পারেন।'

'তখন মুদি কাজলের লোকজন আমাকে মাটি দেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

'তবু, ওই কথাই বলব আমি— মানুষের সব সময় অন্য কিছু করার সুযোগ থাকে।'

'ভুল কথা। কখনো কখনো থাকতে পারে। তবে সব সময় থাকে না।'

'গলা নামিয়ে কথা বলুন। গলা তোলার কিছু হয়নি।'

'গলা নামাব মানে!' স্বাতীর এই শীতল কণ্ঠে বাবু যেন হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে, 'আমি কারো কথা শুনে গলা নামিয়েছি— এমন গত কয়েক বছরে হয়নি।'

'তারা ভয়ে আপনাকে গলা নামাতে বলেনি, বলতে পারেনি।'

'ও, আর আপনি আমাকে ভয় পান না!'

বাবুর দিকে আবার অপলক তাকায় স্বাতী, কিছুটা সময় তাকিয়ে থাকে, তার চোখে চাপা হাসি মুহূর্তের জন্যে খেলে যায়, সে দুপাশে মাথা নাড়ে, অর্থাৎ নাহ্, সে বাবুকে মোটেও ভয় করে না।

বাবুকে দেখে মনে হয় সে অপ্রস্তুত, কিছু একটা বলার জন্যে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

স্বাতী স্বাভাবিক গলায় বলে, 'আমি যে কাউকেই ভয় করি না, সেটা আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত ছিল।'

'আপনারও বোঝা উচিত ছিল— আমার সামনে তখন আর কোনো পথ খোলা ছিল না।' বাবু গলা নামিয়ে নিয়ে বলে, 'পরিস্থিতি আমাকে মাস্তান হওয়ার পথেই ঠেলে দিয়েছে।'

'আমি এর পরও বলব, উপায় ছিল, অন্য কিছু করার, অন্য কিছু হওয়ার।'

'আপনার কী উপায় ছিল ?'

বাবু আচমকা এমন ভঙ্গিতে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয়, স্বাতী একটু থতমত খেয়ে যায়, 'আমার উপায় মানে!'

'আপনাকে যখন উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর... তারপর যখন... আচ্ছা, তখন যদি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ওই দল আমাদের ওখানে হঠাৎ অ্যাটাক না করত, আপনি কী করতেন ? কী সুযোগ ছিল আপনার সামনে নিজেকে রক্ষা করার ?'

বাবুকে এসব কথা বলার সময় উত্তেজিত দেখায়। তার চোখমুখ লালচে হয়ে যায়। তার পরই হঠাৎ তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। খুব দ্রুত সে পরিবর্তন। যতটা আক্রমণাত্মক ছিল সে, ততটাই রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। তাকে দেখে মনে হয় লজ্জা ও অনুশোচনায় সে মরে যাচ্ছে। তার মাথা একটু একটু করে ঝুঁকে পড়ে, নিচু হয়ে যাওয়া মুখ না তুলেই সে বলে, 'মাফ করে দেবেন, প্লিজ, আমাকে মাফ করে দেবেন, আমি বলতে চাইনি, আমি কক্ষনো এ কথা বলতে চাইনি।'

প্রথমে স্বাতীকে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু সেটাও সাময়িক। এর পরপরই তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, 'এত দুঃখিত হওয়ার কিছু হয়নি। আপনার লজিক ভালো।'

মুখ তোলে না বাবু।

'কথাটা বলেই ফেলেছেন, ফিরিয়ে যখন নিতে পারবেন না, তখন মুখ তুলুন। তা ছাড়া অনুশোচনায় ভুগছেন, এমন একটা ভাবও নিয়েছেন...।'

'না না, ভাব না, বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি সত্যি...।'

'আপনি যখন কথাটা বললেন, আমি একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম— মেয়েদের প্রতি আপনার একটা আক্রোশ আছে। মনে হলো আমাকে আঘাত করে আপনি মজা পাচ্ছেন।'

'না...।'

'সেদিনও মনে হয়েছিল।'

'কোন দিন ?... ও।'

'যেন প্রতিশোধ নিতে চাইছেন আপনি।'

বাবু চুপ করে থাকে।

'আমি জানি কিসের প্রতিশোধ।' স্বাতী মৃদু গলায় বলে।

বাবু মুখ তোলে, 'আপনি কীভাবে জানেন ?'

'জানি।'

'আমার ধারণা আপনার অনুমানশক্তি মোটামুটি ভালো।'

'শুনুন...।' স্বাতী বলে, 'মাইক্রোবাসে আপনাকে তুলে নেয়া হলো, তারপর ? তার পরের ঘটনা কিন্তু শোনা হলো না।'

অনেকক্ষণ পর বাবু হাসে, 'আপনার অনুমানশক্তি তো ভালো।'

'হুঁ।'

'আপনি সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন— তারপর কী ?'

'হুঁ, অনেকটাই পারি।' একটু ভাবে স্বাতী, 'তবে ঘটনাটা, মানে ওই অংশটুকুও আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'আপনার বুঝতে পারার কথা ওর পরের অংশ সামান্যই।'

'ওই সামান্য অংশই আমি শুনব। বলুন।'

'বলব ?' বাবু মৃদু গলায় বলে, 'কিন্তু এখন আর ওসব বলতে ইচ্ছে করছে না আমার, পরে বলব, আমি পরে বলব আপনাকে।'

মাইক্রোবাসে তাকে তুলে নেয়া হয় মুহূর্তের মধ্যে। প্রথমে অনুভূতি কাজ করে না, তার পরই শরীর বেয়ে একটা হিমশীতল সাপ ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করে। সে বুঝতে পারে তার আয়ু আর নেই, অল্পক্ষণ। হয়তো এই এখনই দুম করে শব্দ হবে, গুলি করবে তাকে, গুলি করে গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে দেবে। এই ধারণা হয় তার, পাশাপাশি অদ্ভুত এক অনুভূতিও তৈরি হয় তার ভেতর। সে অবাক হয়ে খেয়াল করে তার ভয় করছে না। এই এরা, যারা তাকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়েছে, এই এখনই কিংবা একটু পরে তাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু তার ভয় করছে না।

পেছনের সিটে দুজন দুপাশ থেকে চেপে ধরেছে তাকে। দুজনের একজন তার কোমরের কাছে পিস্তল ধরে রেখেছে, আরেকজন মাথা নিচু করে ধরে রেখেছে। খুব একটা জোর দিয়ে ধরেনি তারা। ইচ্ছে করলেই সে ছিটকে উঠতে পারে। তখন হয়তো গুলি করবে। তা করুক, গুলিই তো করবে, সে মারা যাবে, তাকে ছুড়ে ফেলে দেবে রাস্তায়, এই তো, এর বেশি তো আর করবে না। তা করুক গুলি, করুক।

কেউ তাকে গুলি করে না। মাইক্রোবাস কোথায় যাচ্ছে তা সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। তবে মাথা তোলার বা সামান্য নড়েচড়ে বসার চেষ্টাও সে করে না। একটা কথাও বলে না সে। এমন এমন ভাব নিয়ে নিশ্চুপ পড়ে থাকে, যেন কিছুই হয়নি।

একসময় কালো কাপড় দিয়ে তার চোখ বেঁধে ফেলা হয়। বাবু বুঝে নেয় সম্ভবত গুলি করার আগে তাকে ওরা ব্যাপারটা বুঝতে দিতে চাইছে না। এর অবশ্য দরকার ছিল না, তার মনে হয়। চোখে কাপড় বেঁধে গুলি করা আর না বেঁধে গুলি করা একই ব্যাপার।

সে রকম কিন্তু কিছু ঘটে না, অর্থাৎ তাকে গুলি করা হয় না। বরং গাড়ি এক জায়গায় এসে থেমে যায় এবং তাকে চোখ বাঁধা অবস্থায় নামানো হয়। একটু এগিয়েই সম্ভবত একটা বাড়ির ভেতর ঢোকানো হয় তাকে। হ্যাঁ, বাড়িই, কারণ আরো কয়েক পা হাঁটার পর দরজা খোলার শব্দ হয়, শব্দ হয় সুইচ টেপারও। কালো কাপড় চোখে থাকলেও বাবু বুঝতে পারে আলো জ্বলে উঠল। সেখানে ছেড়ে দেয়া হয় তাকে, একজনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'বিশ্রাম লও।' তার প্রায় পরপরই দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়।

একটু অপেক্ষা করে চোখের কাপড় সরিয়ে ফেলে বাবু। ছোট একটা ঘর। একপাশে একটা চৌকি। আরেক কোণে টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, কয়েকটা বাক্স। বাবু একটু এগিয়ে একটা বাথরুমও দেখতে পায়। কী ঘটবে, কী ঘটতে পারে না-পারে এসব আর মাথায় আসে না, সে বাথরুমে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে বারবার হাতমুখ ধোয়, মুখে জল দেয়, হাত কচলায়। দরজায় নক করার শব্দ না হলে সে হয়তো আরো কিছুটা সময় বাথরুমে থাকত। দরজা খুললে একজনকে বিরিয়ানির প্যাকেট আর পানির বোতল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। লোকটি প্যাকেট আর বোতল বাবুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'একটা কথাও বলবা না, খায়া লও, খায়া ঘুম দ্যাও। সোজা ঘুম। দরজা ভিতর থেইকা বন্ধ করবা না, খোলা রাখবা।'

বাবু তা-ই করে। গোগ্রাসে খায়, এক চুমুকেই যেন পানির বোতল শেষ করে ফেলে। হাত ধুয়ে এসে সে বিছানায় বসতে বসতেই ঘুম তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমটায় কিছুই মনে করতে পারে না বাবু। আবার সবকিছু যখন তার মনে পড়ে যায়, তখন সে বুঝতে পারে না— এসব কী ঘটছে! মুদি কাজলের লোকজন কেন তাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে! শুধু বাঁচিয়েই রাখেনি, তাকে খেতে দিয়েছে, ঘুমাতেও দিয়েছে। আসলেই তো, এসব কী হচ্ছে!

'মরণ ঘুম দিছিলা নাকি?' তখনই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একজন বিরক্ত গলায় বলে, 'উঠো, মুখ ধুইয়া বাইরে আসো। বস্ অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হইয়া যাইতেছেন।'

বস্? বস্ কে? কিসের বস্, কার বস্? কিসের জন্যে বসের অপেক্ষা? সে কেন যাবে বসের কাছে? এই প্রশ্নগুলো দ্রুত উঠে আসে। লোকটা 'জলদি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর?

তারপর ছোটখাটো আকারের অতি সাধারণ নিরীহ চেহারার যাকে দেখে বাবু, তাকে আগে সে কোনো দিন দেখেনি। কে এই লোক, কী তার পরিচয়, আর কেনই বা তাকে এই লোকের মুখোমুখি করা হয়েছে!

লোকটা তাকে আপাদমস্তক দেখে, যেন 'কিছু একটা ব্যাপার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না' এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। মুখে হাসি ফোটে লোকটির, হাসিটা অদ্ভুত, হাসতে হাসতেই গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে তুমিই মুদিটারে মারছ? আশ্চর্য!'

বাবু চুপ থাকে। কারণ সে বুঝতে পারছে না, সে কী বলবে।

'তুমি, তুমি এইটুকু পোলা...।'

পাশে দাঁড়ানো একজন বলে, 'ছোট মরিচের ঝাল বেশি বস্।'

লোকটা মাথা নেড়ে সায় দেয়, বাবুর দিকে তাকায়, 'ঘটনা যা শুনছি, সত্য?'

বাবু চুপ থাকে।

'কথা কও। এইখানে ভয়ের কিছু নাই।'

বাবু জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কি পুলিশের লোক ?'

ঘর কাঁপিয়ে উপস্থিত সবাই এমনভাবে হাসতে থাকে, বাবু খুবই লজ্জা পায়। শুধু লোকটা সামান্য হেসেই থেমে যায়, বাবুর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে, বলে, 'কাঁচা, একদমই কাঁচা, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাছি তোমারে বানায়া নেয়া সম্ভব। এখন কও, ঘটনা সত্য ? ঘটনা কও। আমরা হুনছি লোক মারফত, এখন তোমার মুখ থেইকা হুনি। কও, আমার নাম ইসমাইল, আমি হুনি।'

লোকটা ধীরে ধীরে তার মুখ থেকে প্রায় সব কথাই বের করে নেয়। বলে, 'আমরা তোমারে আগে পাইছি, তাই প্রাণে বাঁইচা গেলা। মুদির লোকজন অহনও তোমারে খুঁজতাছে। ওরা তোমারে পাইলে তুমি বাঁচতা না।'

বাবু জানে সেটা।

'এহন তুমি জিগাইতেই পার, তোমারে খুঁইজা ক্যান বাইর করলাম। তুমি মুদিরে মারছ, মারছ। ঘটনা শেষ, আমার কী ?'

হ্যাঁ, লোকটার কী— এটা বাবুর জানার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু তখনই তার জানা হয় না। কারণ লোকটা ওই বিষয়ে আর একটা কথাও বলে না। পরে বাবু ধীরে ধীরে জানতে পারে, ব্যাপারটা হচ্ছে দু'দলের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। মুদি কাজল বেশ কয়েকবার ইসমাইল ভাইকে ফেলার চেষ্টা করেছে। ইসমাইল ভাইও একই চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। যেভাবেই ঘটাক ইসমাইল ভাইয়ের জন্য দরকারি ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলেছে বাবু। সুতরাং বাবুর প্রতি এই আন্তরিকতা। তবে এগুলো পরে জেনেছে সে। আগের কথা হচ্ছে, ইসমাইল ভাই তাকে বলে, 'তুমি আর কই যাবা! এইদিকে মুদির লোকজন তোমারে খুঁজতাছে আর ওইদিকে পুলিশও তোমারে খুঁজতাছে। তোমার যাওনের জায়গা নাই, করনেরও কিছু নাই। তুমি আমার লগে থাকো, আমি তোমারে তৈয়ার করি।'

বাবু ইসমাইল ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকতে আরম্ভ করে।

স্বাতী মৃদু গলায় বলে, 'আজ অবশ্য আমি জানতে চাইব না যে আপনার কি ওই ইসমাইল ভাইয়ের কাছে থাকতে আরম্ভ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ?'

আজ বাবু স্বাতীর বাসায় যায়নি। যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু রওনা দেয়ার কিছু আগে মোবাইলে স্বাতীর ফোন, 'আপনি আসবেন না।'

'কেন ?' বাবু জিজ্ঞেস করে।

'ভাইয়া শুনেছে আপনি আসবেন। সেই থেকে ভীষণ খেপে আছে।... আপনি রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে আসতে পারবেন ?'

'ওখানে...?'

'কাছেই তো, আমি প্রায়ই যাই। এই ধরুন ৫টার দিকে আসুন।'

একটু ইতস্তত করে বাবু বলে, 'আচ্ছা।'

এসেছে সে। যদিও এ রকম খোলা জায়গায় তার একা একা আসাটা খুবই রিস্কি হয়ে যায়, তবে স্বাতী আসতে বলেছে, তার পক্ষে না এসে থাকা সম্ভব নয়।

স্বাতীর কথা শুনে বাবু মৃদু হাসে, 'জিজ্ঞেস করবেন না ?'

'না, ওই কথা জিজ্ঞেস করব না। অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'কী...।'

'ইসমাইল ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে আপনি কত বড় মাস্তান হয়ে উঠলেন ?'

বাবু অসহায়ের মতো বলে, 'জানি না।'

'আচ্ছা, আরেকটা কথা। আপনি বলেছেন এখন মাঝে মাঝে প্রচণ্ড এক অনুশোচনা আপনাকে গ্রাস করে, এই জীবনকে আপনার অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তাহলে বলুন, এ রকম কি মনে হয় না— সাত-আট বছর আগে ইসমাইলের বদলে মুদি কাজলের লোকজনই যদি আপনাকে প্রথমে পেয়ে যেত, ধরে ফেলত এবং মেরে ফেলত আপনাকে, সেটাই কি আপনার জন্যে ভালো হতো না ?'

'আপনি কি আমার মৃত্যু কামনা করছেন ?'

'আমার প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করুন। আপনি যদি সে সময়ই মারা যেতেন, তবে এত বড় মাস্তান হওয়ার ভার আপনাকে বহন করতে হতো না। অনুশোচনায় ভুগতেন না, জীবনকে অর্থহীন আর অপ্রয়োজনীয় মনে হতো না...।'

মাথা নিচু করে থাকে বাবু, ধীরে ধীরে সে হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকায়, 'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, হয়তো সেটাই ভালো হতো।'

'থাক...।' স্বাতী কঠিন গলায় বলে, 'এ রকম নরম সুরে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না। এসব কথা আপনি আপনার ইসমাইল ভাইকে গিয়ে বলতে পারবেন?'

'আপনি ইসমাইল ভাইয়ের ওপর খুবই খ্যাপা। কিন্তু উনি যত বড় ক্রিমিনালই হন না কেন, ওনার কিছু ভালো দিকও আছে।'

'এই যেমন আপনাকে মাস্তান বানিয়েছেন?'

'আমি মাস্তান হয়েছি তার আশ্রয়ে, তার হাতে, এটা ঠিক।' বাবু হেসে ফেলতে গিয়েও থেমে যায়, 'কিন্তু আমি বলব তিনি আমাকে মাস্তান বানাননি, আমাকে মাস্তান বানিয়েছে পরিস্থিতি, আমার নিয়তি, আমার ভাগ্য। এবং এটাই ঠিক।'

'বোঝা যাচ্ছে আপনি ইসমাইলের ওপর দোষ চাপাবেন না। বেশ, এবার তাহলে ওনার গুণের কথা বলুন। যদিও ওসব শুনে আমার কোনো লাভ নেই?'

'একটা কথা বলি? শুধু একটা কথা?'

'কী, উনি রবিনহুড? ধনীর সম্পদ লুটে, বড়লোকদের দান করেন উনি?

'না।... সেদিনের ওই ঘটনার পর তিনি আমাদের সবাইকে প্রচণ্ড বকাঝকা, গালিগালাজ করেন।... রতনকে কঠিন শাস্তি দেন। আমাকে এমন তিরস্কার করেন..., বলেন, তুমিও বাবু, তুমিও! তুমিও মেয়েদের সম্মান দিতে শিখলা না!'

'এই কথা সত্যি বলেছেন উনি!'

'বলেছেন।'

'তাহলে আমিও বলি, ছি ছি, সত্যি আপনিও! আমি অন্যদের কথা বলব না। কারণ আমি তাদের চিনি না, আমি শুধু আপনার কথা বলব, আপনি, সত্যি আপনিও মেয়েদের সম্মান দিতে শেখেননি।'

'খবরদার, খবরদার বলছি মাথা নিচু করবেন না।' বাবুর মাথা একটু একটু করে নিচু হতে আরম্ভ করে। তা দেখে স্বাতী চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই এক ঢঙ পেয়েছেন আপনি, কিছু বললেই মাথা নিচু করেন, যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন!'

বাবু মাথা নিচু করে না, তবে সে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

'মাথা নিচু যে করেন, লজ্জায় করেন? লজ্জা আছে আপনার! আপনার মতো মাস্তানদের আবার লজ্জা থাকে নাকি! নর্দমার পচা-গলা কীটও আপনাদের চেয়ে উন্নত মানের এবং প্রয়োজনীয়।'

বাবুর চোখ লাল হতে সময় লাগে না, মুহূর্তের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে সে স্বাতীর দিকে তাকায়।

'কী ভেবেছেন আপনি, আপনি ওরকম কঠিন চোখে গরম চোখে তাকাবেন আর আমি ভয় পেয়ে যাব?' স্বাতীর মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে, 'আমি যে ভয় পাই না, আমি যে ভয় পাওয়ার মেয়ে নই, সেটা আপনি আগে টের পাননি? আর... আর ওভাবে তাকাতে একটু লজ্জাও লাগে না! ও, লজ্জা থাকলে তো লজ্জা করবে!'

'স্বাতী...।' বাবু মৃদু গলায় বলে, 'আমি বহুবার ক্ষমা চেয়েছি আপনার কাছে...।'

'ও, ক্ষমা চেয়েছেন! আপনার কি ধারণা, আপনি ক্ষমা চেয়েছেন, আর আমি আপনার সঙ্গে গল্প করছি, এই বধ্যভূমিতে ডেকে এনেছি বলে কি আপনার প্রতি আমার এক ধরনের ভালোবাসা জন্মে গেছে, আপনাকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছি?'

'না না, আপনি এসব কী বলছেন!' বাবুকে খুবই বিব্রত দেখায়, সে সজোরে মাথা নাড়ে, 'আপনি আমাকে শুধু ঘৃণাই করতে পারেন। আর কিছু নয়।'

'জি, ঠিক বলেছেন। শুধু ঘৃণাই আপনার প্রাপ্য এবং আমি তা-ই আপনাকে করি।'

'অসুবিধা নেই, আপনি বলুন।'

'এখন কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না। ঘৃণা করি আপনাকে, নোংরা ভাবি আপনাকে।'

বাবু আবার মাথা নিচু করে।

'কুৎসিত এক অপমান আপনারা আমাকে করেছেন, আপনারা হায়েনার দল আমাকে চরম অপমান করতে যাচ্ছিলেন, আমি... আমি...।' স্বাতীর গলা ভিজে আসে, 'আমি কী করে ওই দিনের কথা ভুলব!'

স্বাতী হু হু করে কাঁদতে থাকে। তাকে সময় দেয় বাবু। বেশ কিছুটা পর স্বাতী যখন কিছুটা শান্ত স্বাভাবিক, বাবু তখন মৃদু গলায় বলে, 'ওই দিনের কথা আমিও ভুলিনি। ওই দিনের কথা মনে হলে বিশ্বাস করুন, লজ্জায় আমি শুধু ছোট না, খুব ছোট হয়ে যাই।... আমি, আমিও ওই দিনের কথা কখনো ভুলতে পারব না। ওই একটি দিন সারা জীবন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।'

না, একটুও মিথ্যে বলেনি বাবু। স্বাতী তার কথা বিশ্বাস করল কি করল না, এটা তার কাছে বড় কথা নয়। তবে সে চায় স্বাতী তার কথা বিশ্বাস করুক। স্বাতী বিশ্বাস না করলে কী যায়-আসে তার, এ নিয়ে সে ভাবে না, কিন্তু সে চায় স্বাতী বুঝুক সে মিথ্যে বলছে না। তবে তার কাছে এর চেয়েও বড় ব্যাপার, ওই যে কথা— ওই দিনের কথা

কখনো সে ভুলতে পারবে না। ওই দিনের ভয়াবহ স্মৃতি সারা জীবন তাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করবে— এ কথাটা যত না সে স্বাতী বা অন্য কাউকে বলে বা বলতে চায়, তার চে বেশি বলতে চায় নিজেকে, নিজেকে সে বারেবারে বলতে চায় এ কথা।

প্রথমে কথাটা তুলেছিল রতন, অবশ্য তার আগেই জনির মুখ থেকে শুনেছিল সে, রতন টার্গেট করেছে মেয়েটাকে। শুধু বড় ভাইকে নিয়ে মেয়েটার সংসার। বাবা-মা কেউ নেই, কিংবা কে জানে আছে হয়তো গ্রামের বাড়িতে, থাকুক, সেটা তো কোনো ব্যাপার না। এখানে তারা থাকে বাবুদের শক্ত নিয়ন্ত্রণ আছে এমন এলাকার এক বাড়িতে। বাড়িটা একটু পুরনো ধাঁচের। ছোট বাড়ি, কিন্তু বাড়ির সামনে উঁচু গেট। সেই গেট মাধবীলতা বা মানিপ্লান্টে ছেয়ে গেছে। মেয়েটির ভাই ছবি আঁকে, এটা তারা জানে। সেসব ছবি নাকি বিভিন্ন ছবির দোকানে বিক্রিও হয়। মেয়েটি কী করে, তা তারা জানে না। লেখাপড়া করে হয়তো। তবে গান নাকি ভালোই গায়, এটা জনি বলেছে, সে নাকি শুনেছে দু দিন ওই বাড়ির পাশে এক কাজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে।

কিন্তু এতসব খবরে রতনের কী দরকার ? বাবুরও দরকার ছিল না। সেই কবে, মামার বাসায় থাকতে, মেয়েদের প্রতি সব আগ্রহ সে হারিয়েছে। তবু কীভাবে সেও যেন জড়িয়ে পড়ে। মেয়েটিকে দেখেছে সে, মেয়েটি সুন্দরী। না, তাকে দেখে এমন মনে হয় না যে আকাশ থেকে হঠাৎ একটা পরি উড়ে এসেছে। তবে হ্যাঁ, মুখটা বড় মায়ামাখা, মায়াবতী। রাস্তা দিয়ে যখন অহঙ্কারী ভঙ্গিতে হেঁটে যায়, তখন অহঙ্কার ভেদ করে মায়াই প্রবল হয়ে ওঠে। যেন দুপাশে মায়া আর ভালো লাগা ছড়াতে ছড়াতে যায়, মনে হয় প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে একখণ্ড মেঘ যেন হেঁটে হেঁটে যায়।

রতন একদিন বলে, 'দোস্ত, চান্স লইবি ?'

রতনের সঙ্গে তার 'দোস্ত' সম্পর্ক। উল্টো দুজন তারা দুজনকে দেখতে পারে না। বেশ কয়েকবার তাদের মধ্যে লেগে লেগেও লাগেনি। ওই যে একবার, একজনের জন্যে অ্যামবুশ পেতে তারা অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করতে করতে বাবুর পুরনো দিনের, ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, লোকটা বা তার সঙ্গীদের কেউ আসেনি সে রাতে, তাদের অপেক্ষাই বৃথা গিয়েছিল, সে রাতে বারবার লাগতে গিয়েছিল, রতন আর বাবুর। ওখানে উপস্থিত দলের অন্যরা প্রতিবার তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে না পড়লে, আবার কখনো দুজনকে দুপাশে টেনে না নিলে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারত। অথচ সেই রতনের কথায় বাবু রাজি হয়ে যায়। প্রথমে অবশ্য সে এড়িয়ে যায়, পরে বারবার বলায় ইতস্তত করতে আরম্ভ করে, 'এই কাম...!'

'অরে দেখছস ?'

বাবু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

'আহা রে, কেমুন সোন্দর!'

জীবনে কত আজব ঘটনা ঘটে। বাবু রাজি হয়ে যায়। কেন সে রাজি হয়, বাবু নিজেও বুঝতে পারে না। এ রকম কিছু করার কথা সে আগে কখনো ভাবেনি। এই মেয়েটাকে তুলে আনা যায়, এ রকম কোনো চিন্তাও তার মাথায় আসেনি। আসলে সে তো এসবের মধ্যে কখনো ছিল না, কখনো এসব কথা ভাবেনি, ওরকম ইচ্ছে তার হয়নি। তাহলে কেন সে রাজি হলো? অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত, কেন সে রাজি হলো— এই প্রশ্নটাই তার মাথায় আসেনি। আবার পরে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে এই প্রশ্ন তাকে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির করে রেখেছিল— কেন, হ্যাঁ, কেন সে রাজি হয়েছিল, কেন সে অমন একটা নোংরা কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছিল! এই যে এত দিন গেছে, তার বয়স হয়েছে, এত দিনেও সে কখনো মেয়েদের প্রতি শারীরিক বা মানসিক চাহিদা বোধ করেনি। তাহলে কী ব্যাপার, রতন তাকে প্রলুব্ধ করেছিল সহজেই, নাকি এত দিন পর তার শরীরই চাইছিল কিছু?

ওসব কথা মনে করে লাভ নেই, সে জানে। কারণ ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে। এখন ইচ্ছে করলেই আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না। তবে সে যা-ই হোক, ওই প্রশ্নগুলো থেকে তার মুক্তি নেই।

রতনকে বাবু জিজ্ঞেস করে, 'ক্যামনে কী করবি?'

রতন খ্যাকখ্যাক করে হাসে, 'এইডা কুনো ব্যাপার!'

'শুনি।'

'সন্ধ্যার পর গান শিখাইয়া ফিরে, কুনো কুনো দিন রাতও হয়। উঠায়া নিমু নে।'

'এত সহজ!'

'আগে করছি তো। এরে না। অন্য মাইয়া। তোরে কই নাই।'

'উঠায়া কই নিবি?'

'পলাশের লব্রির পিছে একটা ঘর আছে। সোন্দর ব্যবস্থা।'

রতনের কথা অনুযায়ী কাজ হয়। এক সন্ধ্যায় তারা চার-পাঁচজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অপেক্ষায় থাকে। একটা মাইক্রোবাস থাকে দাঁড়ানো। ওটায় করে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। দলের পিচ্চি কয়েকজন আছে এদিক-ওদিক। তবে তারা আছে সহায়ক শক্তি হিসেবে, তারা মেয়েটাকে দেখলে সিগনাল দেবে, কোনো ঝামেলা হলে সামলাবে, কিন্তু মূল কাজে অংশ নেবে না।

মেয়েটাকে তারা তুলে নিতে পারে সহজেই। এত সহজ যে বাবু নিজেও অবাক হয়। দূর থেকে এক পিচ্চি সিগনাল দেয়, মেয়েটা রিকশায় আসছে। মাইক্রোবাস স্টার্ট দেয়, সিগনাল বুঝে এগোয়। রিকশা যখন দেখা যায়, তখন গতি কিছুটা বাড়িয়ে সোজা গিয়ে রিকশার একপাশে মৃদু ধাক্কা দেয়। ওটুকুই যথেষ্ট, রিকশা উল্টে যাওয়ার

আগেই জুনিয়র বাহিনী ছুটে এসে রিকশা সামলায়। মাইক্রোবাস থেকে রতন আর শাহজাহান নেমে এসে ছবির মতো মেয়েটাকে টেনে তুলে আনে। মুহূর্তের মধ্যে মাইক্রো চলতে আরম্ভ করে। পেছনে জুনিয়র বাহিনী হইচই জুড়ে দেয়, যেন এমন একটা ঘটনা ঘটল, কিন্তু রাস্তার কেউ বাধা দিতে এল না— এই দৃশ্য তাদের বড়ই ব্যথিত করেছে।

ধাতস্থ হতে মেয়েটা খুব অল্পই সময় নেয়। গাড়িতে উঠিয়েই রতন তার হাত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এঁকেবেঁকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে স্বাতী বলে, 'আপনারা কারা ?'

'বোঝবা সুন্দরী...।' রতন হাসিমুখে বলে, 'সেইটা তুমি একটু পরই বোঝবা।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'সেইটাও বোঝবা।'

'কে আপনাদের বলেছে এটা করতে ?'

'আরে, কও কী, কে বলব! আমাদেরই ইচ্ছা হইল।'

মেয়েটাকে গাড়িতে তোলার পর থেকে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে বাবু। এভাবে, এত কাছ থেকে মেয়েটাকে আগে কখনো সে দেখেনি, দেখেছে কিছুটা দূর থেকে। এখন যতই সে কাছ থেকে দেখে, ততই তার ভেতর এক ঘোর তৈরি হয়। মেয়েটাকে তার খুবই চেনা চেনা লাগে। তার বারবার মনে হয় একে সে দেখেছে, একে অবশ্যই কোথাও দেখেছে সে। কিন্তু কোথায় ? নাকি তার পরিচিত কারো সঙ্গে এর চেহারার অসম্ভব রকম মিল আছে ?

পলাশের লন্ড্রির অবস্থান মেয়েটির বাড়ি থেকে কাছেই। তবে সব কাজেই সাবধান হওয়া উচিত। মাইক্রোবাস তাই ঘুরপথে কিছুটা সময় নিয়ে পলাশের লন্ড্রির একপাশে এসে দাঁড়ায়। এই সময়টায় মেয়েটা আর একটা কথাও বলেনি। যেন সে তার অমোঘ পরিণতি জেনে গেছে। জেনেছে এবং তাই প্রতিবাদ, দুঃখ ও বেদনার মিশ্রণে সে স্থির ও উদাসীন হয়ে আছে। তার শরীরের কোন অংশে রতন কিংবা শাহজাহানের হাত, এই অনুভূতিও যেন তার আর নেই।

পলাশের লন্ড্রির পেছনের ঘরে মেয়েটাকে যখন শক্ত মাটির ওপর শুইয়ে পোশাক খুলে নেয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে রতনরা, মেয়েটা বাধা দেয় না। তবে আর কেউ লক্ষ না করুক, বাবু দেখে মেয়েটার দু চোখের কোণে দু বিন্দু জল স্ফটিকদানার মতো স্থির হয়ে আছে।

'আব্বে ওই...।' রতনের চিৎকারে বাবুর ঘোর একটু যেন কাটে। সে রতনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'এমন জিনিস দেখছস কুনো দিন ? শালি দেখি মাছের মতন চকচক করতাছে।'

বাবু পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেয়েটাকে দেখে। মেয়েটার মুখের ওপর তার দৃষ্টি স্থির হয়। আবার সেই ঘোর ফিরে আসে তার। মেয়েটাকে কোথায় দেখেছে সে, কোথায় দেখেছে! তার পরিচিত কার সঙ্গে এই মেয়েটার চেহারার মিল, কার সঙ্গে ? বাবু প্রচণ্ড রকম অস্থির বোধ করে। সে দেখে, মেয়েটার দু'চোখের কোণে স্ফটিকদানার মতো জমে থাকা জল ভেঙে গিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে আর মেয়েটা শূন্য চোখে কোন দিকে তাকিয়ে আছে, তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাবুর সেই দৃশ্য সহ্য হয় না। সে অসহায় বোধ করে। সে বুঝতে পারে না, কেন সে রতনের সঙ্গে মিশে এমন একটা কাজে জড়িয়েছে! এটা কি আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ? এটা কি সপ্তাহ বা মাসওয়ারি চাঁদা তোলা ? এটা কি মোটা টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করা ? এটা কি কারো হয়ে জমি দখলের লড়াইয়ে নামা ? না, এটা ওসবের কিছুই না। তাহলে ? তাহলে কেন এসেছে সে ? কেন... কেন... কেন ?

মেয়েটাকে প্রায় পুরোই উন্মুক্ত করা হয়ে গেছে। এখন তার নিচের অংশের পোশাক খুলে নেয়া হচ্ছে। বাবুর দিকে তাকিয়ে রতন বলে, 'দোস্ত, তুই আগে লইবি ?'

বাবু 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলে না।

'তরে একটা উপহার দেই। তুই আগে ল। দেখি তর হাতটা দে, দে...।' বাবুর হাত টেনে এনে মেয়েটার বুকের ওপর রাখে রতন, 'নে, এইবার তুই এরে বানা।'

রতনের এই কথায় কিনা, নাকি মেয়েটার পেলব শারীরিক স্পর্শ পেয়ে বাবুর ভেতর ঝড় ওঠে। তার এ রকম এক অনুভূতি হয়— এই মেয়েটা, হ্যাঁ, এই মেয়েটা তার শত্রু, এই মেয়েটা কখনো কোথাও তার প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে, তাকে কষ্ট দিয়েছে, অপমান করছে। এই ঘোরে বাবু যেন দানব হয়ে ওঠে। মেয়েটাকে সে ধ্বংস করে দেবে।

গুলির আওয়াজটা পাওয়া যায় ঠিক এ সময়।

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটার শরীর থেকে তারা ছিটকে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। কে করল এই গুলি ? প্রতিপক্ষের কেউ আক্রমণ চালায় সুযোগ বুঝে। কিন্তু এটা পুরোপুরিই তাদের এলাকা। তা ছাড়া জুনিয়র বাহিনী আছে বাইরে। তেমন কিছু দেখলে তারা মোবাইলে বা সশরীরে এসে খবর দেবে। তাহলে গুলি করল কে ?

তারা ঘরের ভেতর নিঃশব্দে অপেক্ষায় থাকে। বাইরে দৌড়াদৌড়ি, হল্লাসহ নানা ধরনের আওয়াজ পাওয়া যায়। রতন অবাক গলায় বলে, 'এইটা কী কথা! পুলিশ, পুলিশ আইছে এইখানে! পুলিশ ক্যান আইব ?' বলে সে বাবুর দিকে তাকায়।

বাবু তাকিয়ে ছিল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা দ্রুত তার খুলে ফেলা পোশাক পরে নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেও বাবুর কেন যেন মনে হয়, মেয়েটাকে চেনে সে, শুধু মনে করতে পারছে না, এই যা।

স্বাতীর মুখে অদ্ভুত এক হাসি। সেই হাসি নিয়ে সে বাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার তাকানো দেখে বাবুর অস্বস্তি বাড়তে আরম্ভ করে। এই মেয়েটাকে সে বোঝে না, একেবারেই বোঝে না। এত দিন ইসমাইল ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে জীবনের কত কী দেখেছে সে আর বুঝেছে। কিন্তু ইসমাইল ভাইয়ের ওখানে মেয়েদের মন বোঝার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সেই ছোটবেলায়, কৈশোরে আর তরুণ হয়ে ওঠার আগেভাগে মেয়েদের যেটুকু দেখেছে, সেটুকুই তার সম্বল। কিন্তু ওটুকু দিয়ে কি মেয়েদের বোঝা যায়? এত দিন তার মনে হতো— হ্যাঁ, অবশ্যই বোঝা যায়, কেন যাবে না! মেয়েরা তো ওই রকমই। কী রকম— জিজ্ঞেস করলে সে অবশ্য গুছিয়ে কিছুই বলতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, এখন সে নিজেই স্বীকার করে, মেয়েদের কিছুই বোঝে না। সেদিনের ওই ঘটনার পর, আর তারপর কয়েক দিন স্বাতীর সঙ্গে মেশার পর তার এখন মনে হয় মেয়েদের বোঝা সবচেয়ে কঠিন কাজ। এর চে দশটা খুন করে ফেলা অনেক সহজ।

বাবুর গলার অস্বস্তি ও দ্বিধা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। সে বলে, 'আপনি আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

স্বাতীর হাসিটা বড় হয়, 'একজন বিশাল মাস্তানের পরিণতি দেখছি।'

'কী!'

'মানুষ খুন করে, চাঁদাবাজি করে, বাড়ি দখল করে, মেয়েদের রেপ করার চেষ্টা করে— এমন এক মাস্তান এখন আমার পায়ের কাছে এসে বেড়ালের মতো বসে থাকে।... ভুল বললাম?'

বাবু মৃদু না-সূচক মাথা নাড়ে, অর্থাৎ স্বাতী ভুল বলেনি।

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আমার কথা শুনে বিশাল হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন।'

বাবু কিছু না-বলে সামান্য হাসে। সে হাসিতে অবশ্য বিষণ্ণতা ছাড়া কিছু নেই।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে স্বাতী, তারপর বলে, 'কথা অবশ্য এসব না। কথা অন্য।'

বাবু বলে, 'বলুন, শুনি।'

'আমিও বলতে চাই। বলতে চাই বলেই এত দিন ধরে এত কথা। নইলে সে রাতে আশ্রয় দিয়েই আপনাকে বিদায় করে দিতাম।'

'সেই রাতে... আমাকে আশ্রয় কেন দিয়েছিলেন আপনি?'

'বহুবার বলেছি— আপনি অমানুষ আর আমি মানুষ।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' দ্বিধার সঙ্গে বাবু বলে।

'করুন।'

'আপনি কি এখনো আমাকে অমানুষ মনে করেন?'

বাবুর দিকে স্থির চোখে তাকায় স্বাতী, 'কী এমন ঘটেছে যে আপনাকে আর অমানুষ মনে করব না?'

এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই বাবুর। সে বিষণ্ন মুখে চুপ করে যায়।

'সেদিন অমন অবস্থার মধ্যে আমি আপনাকে কয়েক পলক হলেও খেয়াল করেছিলাম। আমি গান শিখি আর শেখাই বটে, ভার্সিটিতে আমার সাবজেক্ট সাইকোলজি। এমনিতেও মানুষের মন বিশ্লেষণ করতে আমার ভালো লাগে।'

বাবু প্রবল আগ্রহ নিয়ে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আমি স্বীকার করছি আপনাকে আমার অন্যরকম লেগেছিল।'

বাবু ঝলমল করে ওঠে, 'আপনি বলতে চাইছেন, আমি ওদের মতো নই?'

'আমি আপনার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম।' বাবুর প্রশ্নের উত্তরের ধার দিয়েও যায় না স্বাতী, 'এত দিন ধরে আপনার সঙ্গে মিশেছি, ভাইয়া আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে, ধমক দিয়েছে, একদিন একটু চুল ধরে টানও দিয়েছে, এ সবই করেছে অবশ্য আমার প্রতি ভালোবাসা থেকে। ভাইয়ার বিস্ময়— আপনার মতো রেপিস্টের সঙ্গে আমার কী কথা... কেন কথা...!'

'আমি রেপিস্ট না। প্লিজ, আমাকে রেপিস্ট বলবেন না। আপনি জানেন...।'

'আমার ঘটনা বাদ দিন। আপনি অন্য কোথায় কী করেছেন, তা কি আমি জানি?'

'বিশ্বাস করুন, আপনি বিশ্বাস করুন আমি কখনো ও-ধরনের কিছু করিনি। আপনি আমাকে খুনি বলুন, চাঁদাবাজ বলুন, যা ইচ্ছে বলুন, শুধু রেপিস্ট বলবেন না, আপনার পায়ে পড়ি...।'

'আমার পা ধরতে চেয়েছেন শুনলে আপনার দলের ছেলেরা হো হো করে হাসবে।'

'হাসুক। হাসুক ওরা।'

'বেশ, হাসুক ওরা। আমি বরং আপনাকে নিয়ে আমার স্টাডির ফলাফল জানাই।'

'আপনি আমাকে বুঝে ফেলেছেন ?'

'আপনার এক অংশ। এটুকু বুঝেছি আমি আপনার গল্প শুনে।... মেয়েদের নিয়ে আপনার একটা সমস্যা আছে। একটা মিশ্র অনুভূতি। আপনি কোনো না কোনো মেয়ের কাছে আশা করে প্রতারিত হয়েছেন, সেই কষ্ট ভোলেননি, আবার হবে হয়তো মেয়েদের কদর্য রূপও আপনি দেখেছেন।'

'প্লিজ, আমাকে একটু ভেঙে বলুন, আমি সত্যি ভালো করে জানতে চাই।'

'ঘটনা ছোট। তবে ছোট ঘটনারও অনেক সময় বড় ইমপ্যাক্ট থাকে। আবার একেক জনের মানসিক গঠনও একেক রকম। কারো হয়তো ওসব ঘটনায় কিছুই হতো না, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আমি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছি।'

'আপনি ছাত্রী, না মাস্টার ?'

'না, আমি এখনো ছাত্রী।' বাবু এমন সরল গলায় জিজ্ঞেস করে, স্বাতী হেসে ফেলে, 'আমার বলার ধরনটা হয়তো শিক্ষকের মতো। কিছু করার নেই, এটা আমার স্বভাব।'

'জি না, ঠিক আছে, আপনি বলুন।'

'আপনার মায়ের মৃত্যু, প্রথম আঘাত এটা। বাইরে থেকে অনেকের মনে হতে পারে। কারণ আপনার বলার ধরনটা ভালো না, মার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব একটা অন্তরঙ্গ ছিল না, এটা ভুল। মা ছিলেন আপনার সবচেয়ে বড় আশ্রয়। সব ঝামেলা, সব বিপদ থেকে মা আপনাকে আগলে রেখেছেন।'

'জি, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি এ রকমই ভাবতাম।'

'মায়ের মৃত্যু আপনাকে নিঃস্ব, অসহায় করে দিয়ে যায়। একই সঙ্গে দুটো ব্যাপার আপনার ভেতর কাজ করে। আপনি ভেতরে ভেতরে নিঃস্ব, অসহায় বোধ করেন, মার অনুপস্থিতি হাহাকার জাগায় আপনার ভেতরে। আবার এই অনুপস্থিতি আপনার ভেতর অভিমানও তৈরি করে। প্রবল অভিমান, যা প্রায় রাগের সমান।'

'জি...।'

'এর আগে মুন্নীর ব্যাপারটাও আছে। মুন্নীকে আপনি ভালোবেসেছিলেন। মুন্নী ছিল আপনার প্রথম প্রেম। মুন্নীর দিক দিয়ে ব্যাপারটা কী ছিল বলতে পারব না। কারণ তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমি পাইনি। তবে ধরে নেয়া যায় ওই অচেনা শহরে সময় কাটানোর জন্যে সে আপনাকে বেছে নিয়েছিল। প্রেম-ট্রেম কিছু নয়, স্রেফ বন্ধু হিসেবেই নিয়েছিল।'

বাবুর মুখে এক টুকরো বিষণ্ন হাসি ফুটে ওঠে।

'তারপর নতুন শহরে গিয়ে বন্ধুর প্রয়োজন হয়েছে, নতুন একজনকে খুঁজে নিয়েছে। হবে হয়তো প্রথম প্রথম আপনার কথা মনে হয়েছে তার। চিঠিও লিখবে ভেবেছে। লেখা হয় নি। তারপর দিন যত এগিয়েছে, ততই সে একটু একটু করে

আপনাকে ভুলে গেছে। এখন হয়তো আপনার কথাই তার মনে নেই, এখন হয়তো ফেলে আসা ওই শহরের কথাই তার মনে নেই এবং এটা অস্বাভাবিকও না।'

সামান্য মাথা ঝাঁকায় বাবু। তার চোখে-মুখে সন্ধ্যার আলোর মতো এক পরশ বিষণ্নতা বাসা বেঁধে থাকে।

'আমি বললাম, এটা অস্বাভাবিক কিছু না, এটা সত্যি অস্বাভাবিক না। কিন্তু এ কথা আমরা এখন বলছি। তখন আপনার বয়স ছিল কম, আর মুন্নীকে নিয়ে আপনার প্রত্যাশাও ছিল অনেক বেশি। ও-বয়সে আবার ওটাই স্বাভাবিক ছিল।'

মুখে সামান্য ম্লান হাসি ধরে রাখা ছাড়া বাবুর আর কিছুই করার নেই।

'আপনি প্রতিটি দিন আশায় থাকতেন— আজ বুঝি মুন্নীর চিঠি আসবে, আজ বুঝি মুন্নীর চিঠি আসবে। কিন্তু মুন্নীর চিঠি আর এল না। আপনি মুন্নীকে মিথ্যুক, প্রতারক ভাবতে আরম্ভ করলেন। আপনার মনে হলো মেয়েরা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়, মেয়েরা ফাঁকি দেয়। এ ধারণা নিয়ে আপনি বড় হয়ে উঠলেন।'

বাবু সামান্য মাথা ঝাঁকায়।

'তারপর আপনার মামাতো বোনের ব্যাপারটা। ওটা একটা কদর্য ব্যাপার। আপনি অবাক হয়ে ভাবলেন— মেয়েরা তাহলে এই! এ রকম! মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিশ্রী ধারণা জন্ম হলো আপনার ভেতর।'

বাবুর চোখে বিষণ্নতা।

'আবার মেয়েদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণও হয়ে উঠলেন আপনি। কারণ একটি মেয়ের কারণেই আপনি আপনার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।... আপনার ভেতর এসব ব্যাপার কাজ করে, কখনো আলাদা আলাদাভাবে, কখনো একসঙ্গে।'

'আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'মা আর মুন্নীর কাছ থেকে আপনি মমতা পেয়েছেন, আশ্রয় পেয়েছেন, আনন্দ পেয়েছেন। ফলে কখনো মেয়েদের ওরকম মনে করেননি। আবার মাকে বাদ দিলে অন্য মেয়েদের কাছ থেকে এসেছে ফাঁকি। ফলে মেয়েদের প্রতি এক ধরনের ক্রোধ জেগে ওঠে আপনার। এদিকে আবার মামাতো বোন এক নোংরা চেহারা দেখিয়ে রেখেছে, তার কারণে পথেও নেমেছেন। ফলে কখনো কখনো সব মেয়েকে ওই বোনের কাতারে নামিয়ে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে আপনার। আবার মার কথা মনে হলেই কখনো কখনো মেয়েদের মমতাময়ী ভাবেন। এ এক জটিল মিশ্রণ। আমার পক্ষে আরো সহজ করে বোঝানো সম্ভব নয়।'

বাবু বড় করে শ্বাস ফেলে চুপ থাকে।

'আপনার...।'

'আমার জীবনটা এ রকম কেন হয়ে গেল!'

'দুঃখিত, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না। সেটা আপনি নিজে বোঝার চেষ্টা করবেন। আমি এখন আপনাকে দুটো, না দুটো না, তিনটা কথা বলব।'

বাবুর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে, 'জি, বলুন।'

'এক, আপনি মেয়েদের যে চেহারা দেখেছেন সেটাই চূড়ান্ত নয়। মেয়েরা আরো নানা রকম হয়। তাদের মধ্যে সহজে ফাঁকি বা নোংরামি থাকে না।'

বাবু তখনই বলে ওঠে, 'জি, সেটা আমি এখন বুঝি।'

'কীভাবে?' সরল গলায় জিজ্ঞেস করেই স্বাতী সতর্ক হয়ে যায়, 'না, থাক। সেটা আপনাকে বলতে হবে না। আপনি কী বলবেন আমি জানি। আপনি বরং দুই নম্বর কথাটা শুনুন।'

বাবু কান খাড়া করে থাকে।

'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এর জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। সে যা-ই হোক— আপনার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল আপনি যা বলেছিলেন, তা সঠিক।' স্বাতী হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, 'আপনার মতো একজন ভালো ছাত্র লেখাপড়া কন্টিনিউ না করে এমন মাস্তান হয়ে উঠবে, ব্যাপারটা শুধু আপনার জন্যে নয়, দেশের জন্যেও বড়ই দুঃখজনক।'

'আমি... আমি... স্বাতী...।'

'তিন নম্বর কথা হচ্ছে, আপনি আমাদের বাসায় আর কখনো আসবেন না।'

'কী!' প্রচণ্ড এক বিস্ময় নিয়ে বাবু তাকিয়ে থাকে।

'আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, শুনতে না পারার কথা নয়, তবু আরেকবার আরো স্পষ্ট করে বলছি— আপনি আমাদের বাসায় আর কোনো দিন আসবেন না।'

ইসমাইল এতটা অবাক জীবনে আর কখনো হয়েছে বলে মনে করতে পারে না। জীবনে কম তো দেখা হলো না তার। জীবনে ঘটনা অসংখ্য। তার ওঠা-বসা সমাজের একদম নিচুস্তরের মানুষ থেকে খুব বড়সড় ব্যবসায়ী আর হোমরাচোমরা রাজনীতিবিদ, আমলা, মন্ত্রী পর্যন্ত। ফলে সে দেখেছে অনেক কিছু, আর জেনেছেও। বুঝেছে, অদ্ভুত এই পৃথিবীতে বহু আজব ঘটনাই ঘটে, ঘটতে পারে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাঝে মাঝেই কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে, এত কিছুর পরও বাবুর এই পরিবর্তন কিছুতেই সে মেনে নিতে পারে না। তার বড় অদ্ভুত লাগে, বাবুর মতো এমন সাহসী একটা ছেলে একটা মেয়ের জন্যে এতটা বদলে যায় কীভাবে!

বাবুকে সে আগেও দুবার বলেছে, কোনো লাভ হয়নি। আজ ডেকে এনেছে হাতে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে। আজ বাবুকে পথে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু বাবুর চেহারাই তার এখন ভালো লাগছে না। কেমন যেন ক্লান্তি আর বিষণ্নতার ছাপ। এ বয়সে কিসের ক্লান্তি ? কিসের বিষণ্নতা ? বাবু তার মূল্যবান সম্পদ। তাকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না, তাকে দরকার।

ঠাণ্ডা গলায় আন্তরিক সুরে তাই সে এভাবে আরম্ভ করেছে, 'বাবু...।'

'জি ইসমাইল ভাই।'

'তোমার সঙ্গে রোজ আমার দেখা হয় না ঠিক, তবে তোমার খবর...।'

'রোজই আপনার কানে পৌঁছায়, এটা আমি জানি।'

এভাবে কথা বলবে বাবু, অনুমান করেনি ইসমাইল, একটু সময় নেয় সে, বলে, 'আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলা বেয়াদবি হয়ে যায় বাবু।'

'জি, স্যরি। ভুল হয়ে গেছে আর বলব না।'

'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমারে বারবার একই কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না।'

বাবু চুপ থাকে।

'আমি তোমারে বলছি মেয়েমানুষরে সম্মান করবা, কিন্তু তাগো সঙ্গে জড়ায়া পড়বা না।'

বাবু এবারও চুপ থাকে।

'তুমি কি জানো, পৃথিবীতে যত অঘটন ঘটছে সবই মেয়েমানুষের জন্যে ঘটছে?'

'ইসমাইল ভাই, তাহলে তো আমাদের সবার জন্মই অঘটন।' ইসমাইল এমন গম্ভীর ও ভারিক্কি গলায় বলে, বাবুর হাসি পেয়ে যায়, 'আমাদের বাবারা আমাদের মায়েদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বলেই না...।'

বাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই ইসমাইল ধমকে ওঠে, 'মুখে মুখে অর্থহীন কথা বলবা না, তুমি আবার বেয়াদবি করতেছ।'

'ভুল হয়ে গেছে ইসমাইল ভাই, আর করব না। মনটা ভালো না।'

'তোমার মন ভালো না-থাকনের আমি তো কুনো কারণ দেখতেছি না। কী হইছে তোমার? এক মেয়ে তোমারে পথে নামায়া দিছে? আশ্চর্য!'

বাবু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোঝে ইসমাইল ভাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। ইসমাইল ভাই বলে, 'বাবু, তোমার মতন বুদ্ধিমান পোলা এইভাবে ধরা খাইব, এইটা আমি চিন্তার মধ্যেই আনি নাই।'

বাবু ইসমাইলকে লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে— তাহলে সে ধরা খেয়েছে!

'আরে বাবু, তোমার কি নিজেরও লজ্জা লাগতেছে না, একটা মাইয়া তোমার মাথায় বাজ ফেলছে? তোমারে ইলেকট্রিক শক খাওয়াইছে?'

বাবু কিছু বলে না। তার ভয়ও হয়, কী বলতে সে কী বলে ফেলবে।

'তুমি কি ভাবছ ওই মেয়ে তোমারে পুছব? মাস্তান ছাড়া তোমার আর কী পরিচয় আছে? আছে কোনো পরিচয়?'

এটা অবশ্য বাবুরও জিজ্ঞাসা। কিন্তু তাই বলে স্বাতীর সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা, স্বাতীদের বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দেবে? বাসায় তো আর যায় না। কারণ বাসায় যাওয়া নিষেধ। নিষেধ মানে পুরোপুরিই নিষেধ। বাবুর প্রথমে ধারণা হয়েছিল স্বাতী একটা কথার কথা বলছে। নিশ্চয়ই সে আবার তাকে বাসায় ঢুকতে দেবে। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটেনি। এখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বাতীদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বাতী বের হলে তার পেছনে পেছনে যায়। আবার স্বাতীর যখন ফেরার সময়, তখনো সে তাই করে। স্বাতী অবশ্য তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

ইসমাইল বিরক্ত গলায় বলে, 'কী এমন হইছে যে এমন দেবদাসের মতো চেহারা লইয়া ঘুরতাছ! খবর পাইছি, পার্বতী তো ফিরাও তাকায় না।'

সেটা বাবুর চেয়ে ভালো আর কে জানে?

'আর এই যে তুমি ওই বাড়ির সামনে দাঁড়ায়া থাকতেছ...।' ইসমাইলের গলা এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি গম্ভীর শোনায়, 'এর ফলে দলের কী ক্ষতি হইতেছে, জানো?'

'দলের ক্ষতি!' বাবু অবাক চোখে ইসমাইলের দিকে তাকায়।

'তুমি দিওয়ানা হইছ। তুমি অ্যাকশনে যাওয়া বন্ করছ। তোমার অবস্থা দেইখা আমিও তোমারে অ্যাকশন নেওয়ার আর সাহস পাই না।'

'ইসমাইল ভাই...।' বাবু নরম গলায় বলে, 'ধরেন, আপনি আমাকে কয়েক দিনের ছুটি দিয়েছেন। ছুটি শেষ হলেই আমি জয়েন করব।'

'তোমার ভাষা দেখি আবার শুদ্ধ হইয়া গেছে। যাউক।' ইসমাইল সামান্য হাসে, 'শুনো, এই ছুটি তোমার শেষ হইব না। তবু ধরো, ছুটি দিলাম। কিন্তু তুমি কি বুঝতেছ না বড় সমস্যা হইতেছে অন্য জাগায়?'

বাবু জিজ্ঞাসু চোখে ইসমাইলের দিকে তাকায়। কারণ সে সত্যি বুঝতে পারছে না আর কোথায় কী সমস্যা সে করছে।

'তোমারে পাগলা বাতাসে ধরছে, এই খবর ছড়ায়া পড়ব। এন্টি পার্টি হাসাহাসি আরম্ভ কইরা দিব। আমাদের জুনিয়রগো মনের জোর নষ্ট হইব। বুঝতেছ ব্যাপারটা?'

'জি।'

'এইটার চেয়েও বড় কথা, তুমি একা একা ওই মাইয়ার বাড়ির সামনে দাঁড়ায়া থাকো। তোমার মন থাকে উড়ু উড়ু, তোমার মন থাকে উদাস। এই সুযোগে, যদিও এইটা আমাদের নিজ এলাকা, তবু এই সুযোগে তোমারে যদি ফালায়া দেয়। ভাবছ এই কথা?'

বাবু দুপাশে মাথা নাড়ে। না, সে এ কথা ভাবেনি।

'তুমি গেলা তো গেলা, এইটা তোমার ক্ষতি। আমার ক্ষতিও বড়। তোমার মতো লোক পামু কই? আর তুমি গেছ— এই খবরে আশপাশের ছোট দলগুলা মাথাচাড়া দিয়া উঠব না? ভাইবা দেখ, এইসব কী আরম্ভ করছ?'

কথা-চালাচালির এক পর্যায়ে ইসমাইল ভাইয়ের মুখ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর, কালো থেকে কালো হয়ে গিয়ে থমথমে, ঝড়ের আগের রূপ নেয়। কথা না বলে হাতের ইশারায় তিনি বাবুকে চলে যেতে বলেন।

বাবু বেরিয়ে এসে বড় করে শ্বাস নেয়। ইসমাইল ভাই এতক্ষণ যা যা তাকে বলেছেন, তার একটা কথাও ভুল, তা সে বলবে না। শুধু ছোট একটা সমস্যা, সে যা যা বলেছে, তার একটাও যে ভুল না, এটা ইসমাইল ভাই মানতে চাইছেন না। এমনভাবে কথা বলছেন তিনি, যেন বাবুর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

আচ্ছা, তার বুদ্ধি যদি লোপ পেয়ে থাকে, সেটা কি কোনো অন্যায় হবে? যদিও সে জানে তার বুদ্ধি লোপ পায়নি, আর কী সে করছে— তাও সে জানে। কেন করছে— হ্যাঁ, এটাও তার জানা। ইসমাইল ভাই যখন বলেন, 'এইসব কী আরম্ভ

করছ', তখন তার বলার ইচ্ছা হয়— কেন আমি এসব করছি তা তো আপনি জানেন। ধরা যাক, আমি একটুও মানুষ না, পুরোপুরিই মাস্তান। তবে মাস্তানও কখনো কখনো আলোর দেখা পায়। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারে নিকষ কালো অন্ধকারের বাইরে এক ফালি আলো দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, স্বাতী আলো, স্বাতী আলো তার কাছে। ভয়ানক অন্ধকারে স্বাতী আলোর ছোঁয়া দিয়ে গেছে তার জীবনে। একটা মেয়ে এমন অদ্ভুত হতে পারে, তার ধারণা ছিল না। একটা মানুষ এ রকম হতে পারে, সে কখনো ভাবেনি।

তা ছাড়া ওর সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে, কথা হবে, ভেবেছিল ? মনে আছে, সব মনে আছে তার, একদিন সন্ধ্যাবেলায়, ডাকাতি, স্রেফ ডাকাতির উদ্দেশ্যে শান্তিনগরে এক বাড়িতে ঢোকে, ঠিক তখনই বাইরে গুলির শব্দ। ওরকম এক পরিস্থিতির জন্যে তারা একটুও প্রস্তুত ছিল না। বাইরের জুনিয়র বাহিনীও কোনো সিগন্যাল দেয়নি। ফলে তারা পরিস্থিতি বুঝতেই সময় নেয় বেশ কিছুটা। বাইরে হইহল্লা বাড়ে, আবারও একটা গুলির শব্দ হয়। তারা দেয়াল ঘেঁষে বিভিন্নমুখী হয়ে পজিশন নেয়।

প্রায় মিনিট দশেক ওভাবে কাটে, মনে হয় যেন অনন্তকাল। একসময় জুনিয়র বাহিনীর একজনের ফোন আসে, 'পুলিশ ঘিরে ফেলেছে জায়গাটা। বাইরে তারা যারা ছিল, সে বাদে সবাই ধরা পড়েছে। সে তাড়া খেয়ে এখানে-ওখানে লুকিয়ে, দৌড়ে পালিয়ে এখন ফোন করার সুযোগ পেয়েছে। জুনিয়র জানায়, তাদেরও পালানো উচিত, কারণ পুলিশ অস্বাভাবিক আচরণ করছে।'

হ্যাঁ, তা তো বটেই, সত্যি পুলিশের এ আচরণ অদ্ভুত। পুলিশ কেন হঠাৎ এ রকম রেইডে নামবে, না বলে ? আর এই বাড়ির চারপাশেই বা তারা অবস্থান নিল কেন ? তবে অবস্থা এখন এমন— এসব ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রেখে আপাতত পালানোর চেষ্টা করতে হবে। জুনিয়র বাহিনীর যারা ধরা পড়েছে, তাদের ছাড়িয়ে আনা কঠিন হবে না। কিন্তু তারা ধরা পড়লে, কে জানে, পুলিশ কী করবে, কীভাবে সাজাবে মামলা, জামিন পাওয়াও তাই কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া খামাখা পুলিশের হাতে ধরা পড়া কেন!

সুতরাং তারা পালানোর চেষ্টা করে, ব্যস, পালাতে গিয়েই পায়ে গুলি খায় বাবু। পলাশের ওখানে পেছন দিকটা নিচু মতো, কাদা-জলে ভরা। গুলিটা লেগেছে বের হওয়ার পরপরই। আঘাত তেমন গুরুতর না, আবার উড়িয়ে দেয়াও যাবে না। চিকিৎসা অবশ্যই দরকার। তবে তার আগেও দরকার আশ্রয়। বাবু বুঝতে পারে এই আঘাত পাওয়া পা নিয়ে তার পক্ষে ডেরায় ফেরা সম্ভব না। পুলিশ যেভাবে হুইসেল বাজাচ্ছে, ছোটাছুটি করছে, এর মধ্য থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আর কী-ইবা করবে সে! কোনো এক বাড়িতে ঢুকে পড়বে ? পিস্তল দেখিয়ে পুলিশ না যাওয়া পর্যন্ত বাড়ির সদস্যদের চুপ করিয়ে রাখবে ? খুব একটা গুছিয়ে ভাবতে পারে না।

সে টের পায় তার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। পুলিশ বা পালানো এমনিতে কোনো ব্যাপার না, কিন্তু আজ সে জীবনে প্রথম গুলি খেয়েছে— এটাই তাকে এলোমেলো করে দিয়েছে।

সে এগোতে এগোতে সুবিধামতো যে বাড়িটা পায় তার দরজার ওপর প্রায় আছড়ে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যায়। সে পিস্তল লুকিয়ে রেখে বাসার ভেতর ঠেলে ঢুকতে যায়। সামনে দাঁড়ানো লোকটা তাকে বাধা দিতে গেলে সে কঠিন চোখ তুলে তাকায়। তখন, ওই অবস্থাতেও যেন ভূমিকম্প হয়, হুড়মুড় করে যেন সব ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে। সে দেখে ওই লোকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কদিন আগে তাদের কবল থেকে পালিয়ে আসা মেয়েটি।

'আপনি দেবী, বিশ্বাস করুন, আপনি মানুষ নন, দেবী।'

স্বাতী বিরক্ত গলায় বলে, 'কয়েকটা দিন তো আপনি আমার সঙ্গে মিশেছেন, আপনার বোঝা উচিত এসব নাটকীয় কথাবার্তা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

বাবুকে অসহায় দেখায়। সে যেন কিছু বলার জন্যে কথা হাতড়ে বেড়ায়, পায় না, তার অসহায়ত্ব আরো, আরো প্রকট হয়ে ওঠে। স্বাতীর জন্যে অপেক্ষায় থাকে সে, স্বাতীর যাওয়া-আসার পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, স্বাতী তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সে স্বাতীর সঙ্গে কথা বলতে চায়, স্বাতী তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কখনো কঠিন চোখে তাকায়ও। আজ এই প্রথম সে বহু কষ্টে স্বাতীকে থামাতে পেরেছে।

আজ বাবু ছিল মরিয়া, সে স্বাতীকে দেখেই সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চাপা গলায় বলে, 'আমাকে দেখুন, প্লিজ, আপনি আমাকে একবার দেখুন।'

স্বাতী তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

'আপনি আমার কথা না শুনলে কী করব, জানেন?'

'আমাকে বিরক্ত করবেন না, আপনার যা ইচ্ছে তা-ই করুন।'

'এই প্রকাশ্য রাস্তায় আপনার পা জড়িয়ে ধরব, ছাড়ব না।'

'আশ্চর্য, আপনি পেয়েছেন কি!'

'আমার একটা কথা শুনুন আপনি, মাত্র একটা কথা।'

স্বাতী বিরক্ত চোখে তাকায়।

বাবু বলে, 'আপনি দেবী, বিশ্বাস করুন, আপনি মানুষ নন।'

তারপর স্বাতীর কাটা কাটা কঠিন উত্তর এবং বাবুর আরো অসহায় অবস্থা। তবে ওই অবস্থায়ও সে বুঝতে পারে, আজ যদি স্বাতীকে কিছু কথা সে বলতে না পারে, তবে আবার কখন কবে সুযোগ পাবে, তার ঠিক নেই। সে বলে, 'আমাকে দেখুন আপনি, দেখুন।'

'আপনাকে দেখলে কি পুণ্য হবে?'

'পুণ্য না হোক, এখন অন্তত পাপ হবে না।'

স্বাতী মৃদু হাসে, 'আচ্ছা।'

'সত্যি বলছি, হবে না। দেখুন আমাকে, আমি সব ছেড়ে দিয়েছি।'

'আপনাকে দেখলেই সেটা বোঝা যাবে?'

'আমাকে দেখে যদি বুঝতে না পারেন, অন্তত আমার কথা শুনে বিশ্বাস করুন।'

'আপনি সব ছেড়ে দিয়েছেন— এটা আমার বুঝতে-ইবা হবে কেন, বিশ্বাসই বা কেন করতে হবে!'

'আমি... আমি আসলে আপনাকে জানাতে চাই, আমি ভালো হওয়ার চেষ্টা করছি।'

'এটা জেনে আমার লাভ?'

'আপনার কী লাভ আমি জানি না, কিন্তু আমি জানাতে চাই।'

'জানলাম। এখন পথ ছেড়ে দিন।'

'এই এখনই ছেড়ে দেব। শুধু কথা দিন— আপনি মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। একটা কথা, দুটো কথা।'

'আশ্চর্য তো!'

'স্বাতী, আপনি দেবী স্বাতী, দেবী।'

'বাজে কথা বলবেন না তো! আমি কেন দেবী হতে যাব!'

'শুধু ওই দিনের কথা মনে করুন আপনি, শুধু ওই দিনের কথা। আমি পুলিশের গুলি খেয়ে আপনাদের বাড়িতে, হ্যাঁ, আপনাদের বাড়িতে হাজির হলাম। তারপর আপনি যা করলেন, তাতে আপনাকে দেবী বললেও কি কম বলা হয় না? আমি তো চোখ বন্ধ করলে আজও সব স্পষ্ট দেখতে পাই।'

'বেশ, আপনি চোখ বন্ধ করে দেখে যান, আমি আমার কাজে যাই।' এই বলে স্বাতী আর দাঁড়ায় না, বাবুকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। বাবু তাকে আটকায় না, সে রাস্তার একপাশে সরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে সত্যি চোখ বন্ধ করে। আর তখন আবারও সবকিছু তার স্পষ্ট মনে পড়ে যায়। দরজা খোলার পর সামনে দাঁড়ানো লোকটার পেছনে স্বাতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে হকচকিয়ে যায় না, ঘাবড়ে যায় না, কেবল নিজের কপালকে ধিক্কার দেয় সে। এত এত বাড়ি থাকতে সে কিনা এই বাড়িতে এল! যতই হুমকি দিক, যতই পিস্তল দেখাক, এই মেয়ে তো এখনই যেভাবে পারে চিৎকার করে তার উপস্থিতি জানিয়ে দেবে। কী করবে সে? পিস্তল দেখিয়ে এই বাড়ির ভেতরই ঢুকে পড়বে, না অন্য কোথাও যাবে? কিন্তু এখানেও সমস্যা, সে আবার রাস্তায় নামলেও মেয়েটি যে চুপ থাকবে, তার কী গ্যারান্টি আছে! প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মেয়েটি যদি চিৎকার করতে আরম্ভ করে, তখন?

সামনে দাঁড়ানো লোকটা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে। তার মাথা ঠিকমতো কাজ করে না। সে আধো অন্ধকারে পিস্তলটা কোমরের পেছনে পিঠের দিকে গুঁজে

বলে, 'রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। পুলিশ আর সন্ত্রাসীদের মধ্যে গোলাগুলি হচ্ছে। একটা গুলি এসে আমার পায়ে লেগেছে।'

'তো ?'

'একটু বিশ্রাম দরকার, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।' এলোমেলো গলায় সে বলে।

'আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।'

'যাব যাব, কিন্তু ভয় লাগছে। রাস্তার অবস্থা খারাপ...।'

'আহা, আপনি পুলিশের কাছে যান। তারাই ব্যবস্থা করবে।'

'না না, আমি যে পথচারী এটা পুলিশকে হয়তো বোঝাতেই পারবে না, কিংবা সময় লেগে যাবে অনেক। ততক্ষণে রক্ত বের হতে হতে...।'

লোকটা ইতস্তত করে, সে সময় পেছন থেকে স্বাতী বলে, 'ভাইয়া, ওনাকে ঢুকতে দাও।'

'কী বলিস তুই! চিনি না জানি না। এসব খুব ঝামেলার ব্যাপার...।'

'আমি চিনি।' স্বাতী অবলীলায় বলে, 'আমার বান্ধবী রিতার মামাতো ভাই। রিতাদের বাসায় দেখেছি।... কী যেন নাম আপনার ?'

'বাবু, বাবু...।' বলতে বলতে সে সামনে এগোয়, মুহূর্তের মধ্যে স্বাতীর তৈরি নাটকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, কিছুটা উদ্ভাসিত করে চেহারা, 'ওহ্ আপনি, কী আশ্চর্য...!'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'স্বাতী, এ কিন্তু গুলি খেয়েছে। কার না কার গুলি...।'

'হ্যাঁ ভাইয়া, গুলি তো পুলিশ বা সন্ত্রাসী যে-কারো হতে পারে, তাই বলে পরিচিত একজনকে এ অবস্থায় আশ্রয় দেব না!'

'সবচেয়ে ভালো হয় ডাক্তারের কাছে...।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে তো যেতেই হবে। তার আগে... দেখি, দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে আসুন আপনি।'

তার স্পষ্ট মনে আছে সবকিছু। ভাইয়ার বেশ কিছুটা আপত্তি সত্ত্বেও স্বাতী তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। আঘাতটা দেখার সুযোগ হয়। বেশি কিছু না, একপাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। আর একটু ভেতর দিয়ে গেলে অবশ্য মারাত্মক হতে পারত। তবে বেশ রক্ত গেছে এবং তখনো যাচ্ছে। বাবু অবাক হয়ে দেখে, না, স্বাতীর চোখে কোনো জিঘাংসা নেই, প্রতিশোধের ছিটেফোঁটা আগুনের উত্তাপও নেই। যেন একটা অসহায় মানুষকে সাহায্য করছে সে। তার এখন কী করণীয় এক এক করে স্বাতীই বলে দিতে থাকে। সে বাথরুমে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে নেয়। ছিঁড়ে যাওয়া জায়গাটুকু পানি দিয়ে পরিষ্কার করে বেরিয়ে আসে। দেখে, ছোট একটা টুলের ওপর

অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড ও ক্রিম দুটোই রাখা, সঙ্গে তুলা, ব্যান্ডেজ, কাঁচি। স্বাতীর কথামতোই সে ধীরে ধীরে অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড দিয়ে ক্ষতস্থানটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেয়, ক্রিম লাগায়, ব্যান্ডেজ করে।

স্বাতী বলে, 'এটা খুবই সাময়িক ব্যবস্থা। আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' স্বাতীর ভাই চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আমি তো সে কথাই বলছি বারবার।... তুই নাহয় তোর বান্ধবীকে ফোন কর। ওরা কেউ এসে নিয়ে যাক।'

'রিতারা বোধহয় ঢাকায় নেই...।' অবলীলায় মিথ্যে বলে স্বাতী। কেন বলে কে জানে! বলে তার দিকে তাকায়।

সে তখনই মাথা ঝাঁকায়, 'হ্যাঁ, ঠিক, ওরা কক্সবাজার গেছে...।'

'তাহলে অন্য কেউ আসুক...।'

'আমরা ছয় বন্ধু একটা বাসা ভাড়া নিয়ে পড়াশোনা করি। ওখানে ফোন নেই। ভাই শুনুন, আমি দেরি করব না, আমি এখনই চলে যাব।'

স্বাতীর ভাই বিরক্ত হয়, স্বাতী কিন্তু স্বাভাবিক, সে জিজ্ঞেস করে, 'চা খাবেন?'

চা খেতে খেতে গল্প হয়। আর স্বাতী তার ভাইয়ার আঁকা ছবিগুলো দেখিয়ে একসময় জিজ্ঞেস করে, 'বলুন তো, কোন ছবিটা বেশি সুন্দর?'

ঘরে ঢুকেই ছবিগুলো চোখে পড়েছিল। ছবিগুলো সুন্দর। স্বাতী জিজ্ঞেস করায় সে একটা সুযোগ পেয়ে যায় ছবি নিয়ে কথা বলার। জিজ্ঞেস করে, 'আপনার আঁকা?'

'না না।' স্বাতী তখনই মাথা নাড়ে, 'আমি কখনো এত সুন্দর আঁকতে পারব না। এসব ভাইয়ার আঁকা। সুন্দর না?'

'সুন্দর, খুব সুন্দর...।' বলতে বলতে সে ছবিগুলো নিয়ে কিছু মন্তব্য করে।

এই মন্তব্যগুলো স্বাতীর ভাইয়াকে অবাক করে দেয়, 'আপনিও কি ছবি আঁকেন?'

'আমি? না না।... ছোটবেলায় বোধহয় এমনি এমনি আঁকতাম।'

সে দেখে, স্বাতীও তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। তখনই হঠাৎ তার বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে। এই, এই মেয়েটাকেই কদিন আগে তারা...! লজ্জায় কুঁকড়ে যায় সে, আর মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়ায়, 'আমি এখন যাব।' সে মাথা নিচু করে বলে।

'বসেন বসেন।' স্বাতীর ভাইয়াই বলেন, 'খেয়ে যাবেন। আসেন, এখন একটু ছবি নিয়ে কথা বলি। ছবি নিয়ে কথা বলার লোক খুব কম।... ওই যে, ওই ছবিটা, আপনি বলছেন ওটার নীল রঙ একটু বেশি হয়ে গেছে, না?'

সেদিন ওই বাসা থেকে খেয়ে তাকে বের হতে হয়েছিল। তারপর কয়েক দিন চিকিৎসা ও বিশ্রামে থেকে আবার যাওয়া। সে গিয়েছিল দ্বিধা নিয়ে। কিন্তু স্বাতী একই রকম হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে। তারপর আরো কত কথা, কত আড্ডা আর বাইরেও দেখা করা। তারপর সেই নির্মম মুহূর্ত, সে যখন টের

পাচ্ছিল দেবীর মতো এই মেয়েটির সান্নিধ্যে তার জীবন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে, তখনই মেয়েটি অতি নির্মম অতি শীতল গলায় তাকে তাদের বাসায় যেতে বা তার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিল।

বাবু চোখ খোলে। সে টের পায় তার দুচোখ ভিজে গেছে। সে চোখ মুছে নেয় না। জলে ভেজা ঘোলাটে চোখে সে তাকিয়ে থাকে, কোন দিকে, তা সে নিজেও জানে না।

এর পরের দিনগুলো যে কীভাবে কাটে, দেখতে দেখতে বাবুর চেহারা বদলে যায়। তার মুখ দাড়িতে ভরে যায়, অনিয়মে সে শুকিয়ে যায়, তাকে ম্লান ও বিধ্বস্ত দেখায়। দলের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। ইসমাইল ভাই প্রচণ্ড খেপে আছে তার ওপর, সে শুনেছে। তার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এটাও ইসমাইল ভাই জানিয়েছে। কিন্তু এসব কিছুই বাবুকে স্পর্শ করেনি। সে যেন জাগতিক তুচ্ছ ব্যাপারগুলোর স্পর্শের অনেক বাইরে চলে গেছে। তার একমাত্র কাজ হচ্ছে, সকালে এসে স্বাতীদের বাড়ির সামনে ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে থাকা। স্বাতীর ভাইয়ার চোখে সে পড়ে না, সে সময় সে সরে থাকে, কিন্তু স্বাতীর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে থাকে। স্বাতী তাকে দেখে না, তাকায়ও না তার দিকে।

স্বাতী একদিন তাকে দেখে। স্বাতী তার দিকে এগিয়ে আসে। সঙ্গত কারণেই বাবুর মনে হয়, তার অপেক্ষার পালা ফুরাল। স্বাতী তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখে, 'এসবের কী মানে!'

বাবু কিছু বলে না, কেবল অপরিসীম আকুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এই মলিন বেশবাশ, মুখভর্তি দাড়ি, চোখের নিচে কালি, কদিন পর বোধহয় বুকের পাঁজর গোনা যাবে— আমি এসবের কথা বলছি। এসবের কী মানে?'

বাবু ভেজা গলায় বলে ওঠে, 'আপনি সব জানেন।'

'আশ্চর্য, আমি কী করে জানব?'

'না, আপনি জানেন, আপনি সব বুঝতে পারেন।'

'শুনুন, এসব ভান-ভণিতা ছেড়ে ভালো হয়ে যান।'

'আমি ভালো হয়ে গেছি, স্বাতী, আমি সত্যি ভালো হয়ে গেছি। আর এসবের কিছুই ভান না, সব সত্যি, আপনি জানেন এসব সত্যি।'

'আবার আশ্চর্য কথা, আমি কীভাবে জানব!'

'স্বাতী, দলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ভালো।'

'আমি লেখাপড়াটা শেষ করব, তারপর চাকরি বা ব্যবসা...।'

'এসব কথা আমাকে বলে কী লাভ!'

'আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন কেন ?'

'আমি কি আপনাকে গ্রহণ করেছিলাম ?'

'না না, আমি তা বলছি না... ।'

'গ্রহণ করলেই না ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন। তাই না ?'

'জি। কিন্তু... কিন্তু কেন আপনি সে রাতে আশ্রয় আর চিকিৎসা দিলেন! তারপর অনেক অনেক দিন ধরে কত গল্প...!'

'তো ?'

'আমি কষ্টে আছি স্বাতী।'

'তাই ?'

'আমি প্রচণ্ড কষ্টে আছি। জীবনে এর চে বড় কষ্ট আর কিছু হতে পারে না।'

'কষ্ট ?'

'হ্যাঁ।'

'কষ্টের কী দেখেছেন আপনি!' স্বাতীর মুখে সামান্য হাসি খেলে যায়, 'কষ্টের বোঝেনই বা কী!'

'বুঝি। বিশ্বাস করুন, এখন বুঝি।'

'গুড। সেটা আপনার জন্যে ভালো।'

বাবুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, 'স্বাতী... ।'

'এক কাজ করুন আপনি।... কাল, না কাল না, আজ; আজ কি একটু আসতে পারবেন আপনি ?'

'আপনি আসতে বলছেন, আর আমি আসতে পারব না ?' বাবুর মুখ হাঁ হয়ে যায়, 'কখন আসব আপনার বাসায়, বলুন ?'

'না, বাসায় না। বাসায় আপনাকে আসতে হবে না।'

একটু থতমত খেয়ে যায় বাবু, 'তাহলে ?'

'গুলশান দুই নম্বর চত্বরের কাছে একটা পার্ক আছে। খুবই সুন্দর আর নিরিবিলি। চেনেন ওটা ?'

'চিনি।'

স্বাতী হেসে ফেলে, 'আপনার মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে চেনেন না।'

'চিনে নেব, চিনে নেব। কোনো অসুবিধা হবে না।'

'বিকেল ঠিক পাঁচটায়।'

'জি জি।'

'বেশ, তাহলে এই কথাই থাকল।' স্বাতী এগিয়ে যেতে যেতেও হঠাৎ থামে, পেছন ফিরে বাবুর দিকে তাকায়, 'তবে কোনো আশা নিয়ে যাবেন না।'

'জি।'

'আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটবে, এমন কোনো আশা নিয়ে যেতে বারণ করছি, বুঝতে পারছেন তো?'

এই কথাটা, এই যে স্বাতী বলে 'আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটবে, এমন কোনো আশা নিয়ে যেতে বারণ করছি'— এটা বাবুর মাথায় ঢোকে না। আসলে স্বাতী তাকে যেতে বলেছে, স্বাতী তার সঙ্গে কথা বলবে, এই আনন্দে সে এতটাই বিভোর হয়ে পড়ে, স্বাতী যাওয়ার সময় কী বলে গেল তা তাকে তেমন স্পর্শ করে না। কথাটা সে শোনে না এমন নয়, কিন্তু কথাটা নিয়ে একটু ভাবে সে। তবে সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্যে। তার মনে হয়, স্বাতী মজা করেছে তার সঙ্গে, যাওয়ার সময় কেবল একটু ইয়ার্কি মেরে গেছে। আসলে কথাটাকে গুরুত্বই দেয় না। দেবেই বা কেন, স্বাতী যে তাকে যেতে বলেছে, এটাই তো তার কাছে বড় কথা।

সময়টুকু তার খুব অস্বস্তিতে কাটে। কেন এমন হয়, সে বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, তার এখন সুস্থির ও আনন্দিত থাকার কথা। তার এত দিনের অপেক্ষা, তার এত দিনের ক্লান্তি ফুরিয়েছে। সে থাকবে ফুরফুরে মেজাজে। কিন্তু কেন এত অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে আছে! সে কি স্বাতীর সামনে গিয়ে সহজ হতে পারবে না? সে কি স্বাতীর সামনে গিয়ে তার সব কথা হারিয়ে ফেলবে?

যতই সময় গড়ায়, ততই তার অস্থিরতা বাড়ে। এমনকি যখন গুলশানের ওই পার্কে খুঁজে পায় স্বাতীকে, তখনো এই অস্থিরতা তাকে ছাড়ে না। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, সে যখন বেঞ্চে বসা স্বাতীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন হঠাৎই তার সব অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। তার মনে হয়, সে এক শান্ত সরোবরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে অস্থিরতার কিছু নেই, এখানে যা কিছু আছে তা হচ্ছে সমর্পিত হওয়ার। সমর্পণের বাসনা চোখেমুখে নিয়ে সে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্বাতী স্বাভাবিক গলায় বলে, 'চিনতে অসুবিধা হয়েছে?'

'না না।'

'এ পার্কটার কথা অনেকেই জানে না। গুলশান পার্কের কথা বললেই অন্য পার্ক বোঝে। কিন্তু ওটায় খুব ভিড়। বাসা থেকে বেশ দূরে হলেও আমি মাঝেমধ্যে এখানে এসে হাঁটাহাঁটি করি।'

'জি...।'

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।'

বাবু তখনই বসে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে স্বাতীর প্রায় গা ঘেঁষে বসে। পরে

অবশ্য সরে যায়। সরে বসে সে বোকার মতো হাসে।

'আমার হাতে বেশি সময় নেই, বাসায় জরুরি কাজ আছে।' স্বাতী বলে, 'যদিও সময়টা আমিই আপনাকে দিয়েছি। যাকগে, সকালে কী যেন বলছিলেন ?'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, আপনি।'

'আপনি আমাকে বললেন, চোখের নিচে কালি, মুখভর্তি দাড়ি, মলিন পোশাক... এইসব...।'

'হুঁ, বলেছি। উত্তরে আপনি বললেন, আমি সব জানি।... আমি কীভাবে সব জানব ?'

'স্বাতী।' বাবুর চোখমুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'স্বাতী, আমি ভালো হয়ে গেছি।'

'সেটা কী রকম ব্যাপার, মানে এই ভালো হয়ে যাওয়াটা ?'

'বিশ্বাস করুন, ওই দলের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ওরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে ?'

'না না, আমি চলে এসেছি।'

'ওরা আপনাকে ছেড়ে দেবে ?'

একটু থমকায় বাবু, আনমনা একটু বুঝি ভাবেও, তারপর মৃদু গলায় বলে, 'তা বলতে পারব না, কিন্তু অত সব ভাবলে আমি তো কখনো দল ছাড়তে পারব না।'

'বুঝতে পারছি। সাবধানে থাকবেন।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু সাবধানে থাকার দরকার নেই। আমার কিছু হবে না, আমি জানি।'

'কীভাবে জানেন ?'

'আমি ভালো হয়ে গেছি, এটা তো আমি জানি।'

'তবু সাবধানে থাকতে দোষ নেই।' স্বাতী ম্লান হাসে, 'তারপর ? এখন কী করবেন ?'

'পড়াশোনা, বুড়ো বয়সে।' বাবু বোকার মতো একটু হাসে, 'যদিও পড়াশোনার কোনো বয়স নেই। পড়াশোনা শেষ করে চাকরির চেষ্টা করব, নইলে ব্যবসা।'

'বাবু...।' স্বাতী আন্তরিক গলায় বলে, 'শুনে সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে।'

বাবুর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে।

'আপনার সঙ্গে কথা বলে, আপনার কথা শুনেও অবশ্য আমার অনেক আগেই মনে হয়েছে, আপনার মধ্যে ভালো হওয়ার সব গুণই ছিল, আছেও।'

বাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'আপনি পড়াশোনায় ভালো। আমি নিশ্চিত আবার পড়াশোনা শুরু করলে আপনি খুব ভালো করবেন।'

'যদিও মগজে মরিচা ধরে গেছে, তবু আমার ধারণা আমি পারব।'

'গুড। এই কনফিডেন্সটা দরকার। তা ধরেন বয়সের কারণে চাকরি যদি নাও পান, পাবেনই না আমি সে কথা বলছি না, না পেলে, আমার ধারণা ব্যবসার ক্ষেত্রেও আপনি নিশ্চয়ই শাইন করবেন।... বাবু, আপনি আবার গোছানো জীবনে, সুস্থ জীবনে ফিরে যাচ্ছেন, এটা খুবই খুশির কথা।'

'একটা কথা স্বীকার করতে আমার একটুও দ্বিধা বা লজ্জা নেই।' বাবু কথা আরম্ভ করে একটুক্ষণ চুপ থাকে, তারপর বলে, 'এই সবকিছুই হয়েছে কিন্তু একজনের জন্যে। সে কে, জানেন ? আপনি, শুধু আপনি।'

'বাবু শুনুন, আমি কিছুই করিনি।'

'আপনিই করেছেন।'

'আমি যদি কিছু করেই থাকি সেটা খুব সামান্য। আমি শুধু আপনার ভালো সত্তাটাকে নাড়া দিয়েছি, একটু উসকে দিয়েছি। এই, এটুকুই।'

'এটুকু বলছেন আপনি! বেশ। কিন্তু এই এটুকু, এটুকুই বা কে করে, বলুন ?'

স্বাতী সামান্য হেসে চুপ থাকে।

বাবুও কিছুক্ষণ কিছু বলে না। তবে তাকে আবারও অস্থির দেখায়, কিছুটা ইতস্তত করে সে বলে, 'একটা কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।'

মুখে কিছু না-বলে স্বাতী জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'এত কিছুর পরও আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন কেন!' নরম গলায় বাবু জিজ্ঞেস করে, 'আমি হঠাৎ আপনার কাছে একটা 'না' হয়ে গেলাম কেন!'

'আচ্ছা...।' স্বাতী বলে, 'আপনি কি বলতে পারবেন, কখনো কোনো সময় আপনি 'হ্যাঁ' ছিলেন ?'

বাবুকে হঠাৎ অপ্রস্তুত দেখায়, বিব্রত দেখায়, 'না না, ঠিক তা না। মানে...।'

'আপনি সকালে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বলেছিলাম— আমি কি কখনো আপনাকে গ্রহণ করেছিলাম!... এখনো আমি ওই একই উত্তর দেব।'

বাবুকে নিতান্তই অসহায় দেখায়, সে ক্লান্ত গলায় বলে, 'আমি... আমি আপনাকে ঘিরে...।'

'অনেক কল্পনার জাল বুনেছিলেন, অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, না ?'

কিছু না-বলে বাবু অপলক স্বাতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'বাবু...।' স্বাতী বলে, 'আমি কিন্তু আপনাকে কিছু কথা বলব বলেই এখানে

ডেকেছি। আপনার হয়তো কথাগুলো ভালো লাগবে না। তবু শুনতে হবে। এবং আপনার ভালোর জন্যেই আপনাকে শুনতে হবে।'

একটু হাসার চেষ্টা করে বাবু, 'বলুন।'

'সবচে কঠিন কথাটাই কি আগে বলব ?'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'সেটাই ভালো হবে।... বাবু, আমি একজনকে ভালোবাসি, সেও আমাকে...।'

বাবুকে দেখে মনে হয় এ মুহূর্তে তার মাথার ওপর প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত ঘটে গেছে। সে ভস্মীভূত মূর্তির মতো বসে থাকে, স্থির, অচঞ্চল; যেন জোরে ফুঁ দিলেই ছাই হয়ে উড়ে যাবে সে। শুধু তার দু'চোখে প্রাণের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, সে ফ্যালফ্যাল করে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ও আমার ছোটবেলার বন্ধু, একদম ছোটবেলার। এখানে কিছু করতে না পেরে গ্রিসে চলে গেল একসময়। ওর বিদেশ যাওয়াটা আমি পছন্দ করিনি, কিন্তু তাতে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়নি।... ও ফিরেছে কিছুদিন হলো।'

'ও।'

'সামনের সপ্তাহে আমাদের বিয়ে।'

বাবু নিঃশব্দে হাসে। তার হাসিটা কান্নার মতো দেখায়।

'বাবু, আমি স্যরি। আপনি... আপনি আসলেও খুব ভালোমানুষ। আপনার সেই ভালোমানুষি সত্তাটা একটা আবরণে ঢাকা পড়ে ছিল।'

'আপনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই আবরণ থেকে আমাকে মুক্ত করে আনার ?'

স্বাতী ধীর ভঙ্গিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকায়।

'আর, আর আমি ?' বাবু কান্নার মতো করে হেসে ফেলে, 'আমি একটা বোকা...।'

'এভাবে বলবেন না বাবু। আপনার সামনে বিশাল পৃথিবী আর ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।'

'থাক, আপনাকে আর উপদেশ দিতে হবে না।'

'আমার ওপর রাগ করে কী লাভ! বরং আমার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে আপনাকে ওই পঙ্কিল জগৎ থেকে আমি বের করে এনেছি।'

'আমার সঙ্গে এখন একটা পিস্তল থাকলে কী করতাম, জানেন ?'

'কী করতেন ?'

'আপনাকে এই এখনই গুলি করতাম।'

স্বাতী হাসতে আরম্ভ করে।

'হাসছেন কেন!' বাবু রেগে যায়, 'হাসছেন কেন আপনি!'

'কারণ আপনি এমন একটা কথা বলছেন, যা কখনো করতে পারতেন না।'

'আমি আপনাকে খুন করতে পারতাম না?'

'না।' স্বাতী দৃঢ় গলায় বলে, 'খুন দূরে থাক, আমার কিছুই আপনি করতে পারবেন না।'

'বেশ, কিছুই আমি আপনার করতে পারব না।' কিছুক্ষণ স্বাতীর দিকে তাকিয়ে থাকে বাবু, তারপর বলে, 'আমি যা করব, তা হলো, আমি আবার দলে ফিরে যাব।'

'না, তাও আপনি পারবেন না।'

'আমি ফিরে গেলে ওরা আমাকে লুফে নেবে।'

'আমি সে কথা বলছি না, আমি বলছি— আপনি নিজেই যাবেন না, যেতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি কিছুই পারব না, তবে এখানে বসেও থাকব না আমি।' বলেই উঠে দাঁড়ায় বাবু, সামনের দিকে পা বাড়ায়। তাকে উদ্ধত, তেজি ও একরোখা দেখায়।

স্বাতী নরম গলায় বলে, 'বাবু, দাঁড়ান।'

এই সামান্য নরম ডাকই অসামান্য কাজ করে। মুহূর্তেরও আগে থেমে যায় বাবু, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে সে স্বাতীর দিকে ফেরে।

'আমার তিনটা কথা বাকি আছে।' স্বাতী বলে, 'একটা অনুরোধ, লেখাপড়াটা ছাড়বেন না, প্লিজ ছাড়বেন না, কথা দিন!'

বাবু মৃদু গলায় বলে, 'দিলাম।'

'আমার দ্বিতীয় কথাটা আপনার অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি মাঝেমধ্যে কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পারি। আমি নিশ্চিত, একটা অতি যোগ্য, পরমা সুন্দরী মেয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

বাবু হাসে।

'আমার কথা বিশ্বাস হলো না?'

'আপনার তৃতীয় কথাটা শুনতে চাই।'

'এটা একটা অনুরোধ।'

'বুঝতে পারছি। কী বলবেন।'

'আমার বিয়েতে আসবেন? প্লিজ আসুন। সঙ্গে বিয়ের কার্ড এনেছি। কিন্তু কার্ড আমি আপনাকে দেব না। ঠিকানা দিচ্ছি কমিউনিটি সেন্টারের। প্লিজ আপনি বলুন, আসবেন?'

শব্দটা জোরালো নয়, কেমন সাপের 'হিস্' শব্দের মতো। তার পরই বিয়ের অনুষ্ঠানের লোকজন অবাক হয়ে দেখে, একজন মুষড়ে পড়ে যাচ্ছে। নিজেকে সামলানোর, ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে, কিন্তু কিছুই কাজে লাগছে না। তাকে অসহায় ও বিমর্ষ দেখাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে তার সবকিছুই শেষ, একদম শেষ হয়ে গেছে। সে হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ারটা ধরতে চায়, পারে না। এলোমেলো হয়ে তার শরীর গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। অথচ এই একটু আগে সে কী উচ্চকণ্ঠ ছিল! কী প্রবল প্রতাপে সে রুখে দাঁড়িয়ে তীব্র গলায় প্রতিবাদ জানাচ্ছিল! তাকে ঘিরেই তৈরি হয়ে যাচ্ছিল জটলা, এখন তাকে পড়ে যেতে দেখে আশপাশ থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে সবাই।

স্বাতীর বিয়ে, বাবু আজ সারাটা দিন বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। সকালে একবার বাথরুমে গেছে, এক গ্লাস জল খেয়েছে, তারপর আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে, অপলক তাকিয়ে থেকেছে ছাদের দিকে। এমনভাবে তাকিয়ে থেকেছে, যেন ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই, যেন ছাদের দেয়ালে অদৃশ্য হয়ে লেখা আছে তার বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ। একটু পরই সেই অদৃশ্য লেখা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে এবং সে জেনে যাবে সবকিছু।

তেমন কিছুই ঘটেনি, ছাদের সাদা দেয়াল সাদাই থেকে গেছে। কিন্তু ওখান থেকে চোখ প্রায় সরায়নি বাবু। সে সকালের নাশতা খায়নি, দুপুরের খাবার খায়নি, ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে আর বারবার মনে হয়েছে তার, জীবন এমন হলো কেন! সে যখন গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর ভেতর পথ-চলার জন্যে পা বড়িয়েছে, তখনই হঠাৎ সবকিছু কেন এমন বদলে গেল! না, স্বাতীকে সে দোষ দিতে চায় না। এমন নয় যে স্বাতীর ওপর তার রাগ হচ্ছে না, স্বাতীকে তার ভেঙেচুরে চুরমার করে দিতে ইচ্ছে করছে না, এ রকম ইচ্ছে তার ক্ষণে ক্ষণেই করছে, কিন্তু এই ইচ্ছেটা বেশি সময়ের জন্যে সে ধরে রাখতে পারে না। তার এ রকমও আবার মনে হয়— না, স্বাতীর কোনো দোষ নেই, সে তো কখনো বলেনি, সে তাকে পছন্দ করে। সে তো অন্য একটা ছেলেকে ভালোবাসতেই পারে। রাস্তার মাস্তান সে, এক নোংরা, অতি নোংরা কাজে অংশ নিতে গিয়ে স্বাতীর সঙ্গে পরিচয়। তার পরও স্বাতী তাকে আশ্রয় দিয়েছে, সময় দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। এর জন্যে রাগ না করে স্বাতীর

প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। শুধু কৃতজ্ঞ না থেকে সে কেন দুর্বল হয়ে পড়ল স্বাতীর প্রতি! দোষ কি তার না ?

নাকি দোষ স্বাতীর ? সে-ই কি উসকিয়েছে ? এমন ভাব করেছে, যেন সেও বাবুকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছে। এসব কি তার ওই নোংরা ঘটনার প্রতিশোধ নেয়া ? হতে পারে। হাতের কাছে আর কাউকে পায়নি, পেয়েছে বাবুকে, বাবুকে নিয়ে তাই এমন খেলায় মেতেছে যেন বাবু তার রূপে, প্রেমে হাবুডুবু খায়। তারপর একসময় বাবুকে সে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর এখন, বাবুর ভোঁ ভোঁ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। এ কি তবে স্বাতীর এক পরিকল্পনার অংশ ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ভাবতেও তার মন চায় না। একটু যখন সুস্থির হয়ে ভাবে, সে বোঝে— এ তার ভুল ধারণা, স্বাতী কোনো প্রতিশোধ নিতে চায়নি। তবে এমন হতে পারে, সে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল, সে নিজের মহানুভবতা দেখাতে চেয়েছিল, বাবুকে ওই পরিবেশ থেকে একটু একটু করে বের করে আনতে চেয়েছিল। যে বাবু তার সর্বনাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিল, তাকে সে জীবনের ভালো দিকগুলো দেখিয়ে দুইয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছিল। স্বাতী ধীরে ধীরে অন্য এক জগতের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল, যে দ্বারের ওপাশে প্রখর আলো আর প্রবল বাতাস। এটাই, এখানেই স্বাতীর তৃপ্তি— তোমরা আমার কী করতে চেয়েছিলে, আর আমি ? আমি দেখো কী করলাম। এখানেই স্বাতীর মহানুভবতা। মানুষের আসলে কেমন হওয়া উচিত, সেটা সে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে সে যা-ই হোক, মূল কথা— স্বাতীকে পাচ্ছে না সে, স্বাতীকে ভুলে তাকে আবার অন্য এক জীবন, নতুন জীবন শুরু করতে হবে। পারবে ? সম্ভব ?

ভাবতে ভাবতে তার যেন ঘোর লেগে যায়, সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে দেখতে পায়, তার মা এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন, 'বাবু, কী খবর তোমার ?'

বাবু একদম অবাক হয়ে যায়, 'মা, তুমি এসেছ! তুমি এত দিন পর এসেছ!'

'হুঁ, আমি আসছি।'

'মা, আমার মন ভালো নেই মা।'

তার মন ভালো না থাকার কথা শুনে মাকে খুব একটা বিচলিত মনে হয় না, মা বলেন, 'মন ভালো করনের সবচেয়ে বড় ঔষধ কী, জানো ?'

বাবুর দুপাশে মাথা নাড়ে, না, সে জানে না।

'গান। গান গাইলেও মন ভালো হয়, গান শুনলেও মন ভালো হয়।'

এই বলে মা একটা গান ধরেন। ঘোরের মধ্যে মার গান শুনতে শুনতে বাবু হঠাৎ জালাল স্যারকে দেখতে আরম্ভ করে। স্যার তার দিকে তাকিয়ে নেই বটে, তবে স্যার যে উদাস চোখে কোন দিকে তাকিয়ে আছেন, তা অবশ্য বোঝারও উপায় নেই।

উদাস চোখে একদিকে তাকিয়ে স্যার বলেন, 'সবকিছু মইরা যায়।... সবকিছু।' কিছুক্ষণ পরই বাবুর মনে হয়, তার বাবা আর সৎমা ছুরি হাতে তাকে তাড়া করেছে। একটুক্ষণ পর সে দেখে জানালায় থুতনি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে মামাতো বোন, তার চোখেমুখে আমন্ত্রণ। মামাতো বোনকে কে যেন ছুটে এসে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়, সেও একজন মেয়ে, কিন্তু বাবু কিছুতেই তার চেহারা মনে করতে পারে না। তার বারবার মনে হয়, এই মেয়েটাকে সে কোথায় যেন দেখেছে, এই মেয়েটাকে সে খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু কিছুতেই সে মেয়েটাকে চিনে উঠতে পারে না।

শেষে সে হাল ছেড়ে দেয় এবং বিছানায় উঠে বসে। স্বাতীর বিয়েতে যাবে না, এ রকম স্থির একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়ে রেখেছিল। কখন সে সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছে, তা সে নিজেও বলতে পারবে না। যেখানে না-যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সে, সেখানে এখন তার পা-ই তাকে টানছে। তার মনে হচ্ছে— তার যাওয়া উচিত, অবশ্যই তার যাওয়া উচিত। তার প্রেম স্বাতী গ্রহণ করেনি, এ কথা ঠিক। তবে স্বাতীর আগে থেকে যদি একটা প্রেম থেকে থাকে, তাহলে কী করবে সে ? কীভাবে সেই ছেলেকে সে ভুলে যাবে ? সে ছেলের কী দোষ ? তা ছাড়া, যতই যা হোক, স্বাতীর প্রতি তার তো কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, স্বাতীকে সে ভালোবাসে। স্বাতী না বাসুক, সে বাসে। এই ভালোবাসার মানুষটা তাকে যেতে বলেছে, সে যাবে। তার বুকে পাষাণ চাপা থাকবে, তার ভেতর থেকে দমকা হাওয়ার মতো, ঝড়ের মতো কান্না উথলে উঠবে, বধূবেশে স্বাতী তাকে বেদনায় নীল করে দেবে, তবু সে যাবে। সে যাবে, যাবে এবং স্বাতীর সামনে দাঁড়িয়ে স্বাতীর মঙ্গল কামনাও করবে।

কমিউনিটি সেন্টারটা চিনে নিতে একটুও কষ্ট হলো না। পথের মাঝখান থেকে একগুচ্ছ গোলাপকলি কিনেছে বাবু। আজ শুধু গোলাপকলিই দেবে সে ? না, বড় একটা কিছুও দেবে সে। তবে আজ না, ওরা সংসার গুছিয়ে বসার পর।

কমিউনিটি সেন্টারের সামনে রিকশা থেকে নেমে হকচকিয়ে যায় বাবু। ইচ্ছে করেই সে একটু দেরি করে এসেছে। কারণ এখানে আগে আসার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সে ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে স্বাতী আর তার পছন্দের পুরুষকে দেখতে চায়। সে যদি ভিড় পাতলা থাকতে চলে আসে, তবে সেটা আর হবে না। তখন তার খারাপ লাগবে বেশি। তার চেয়ে বরং এই ভালো— ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখা। সামনে সে অবশ্য যাবে, সামনে একবারই যাবে সে— হ্যাঁ, তাদের মঙ্গল কামনা করতে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারে না, এত হইচইটা কিসের!

সে কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকে ভেতরকার পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পর তার মনে হয়, দুপক্ষের ভেতর কোনো একটা বিষয়

নিয়ে ভীষণ ঝগড়া লেগেছে বা বড় ধরনের মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। সে এদিক-ওদিক তাকায়, পরিচিত কাউকেই চোখে পড়ে না, পড়ার কথাও না। স্বাতীদের কজনকেই বা সে চেনে, আর বরপক্ষের কাউকেই তো সে চেনে না, চেনার কথাও না। তার সামনেই একটা লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর ঘরের ভেতরের দিককার জটলার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা যে বরপক্ষের, বোঝা যায়। বিয়ের দিন বরপক্ষের লোকজনের মধ্যে একটা ভাব থাকে, এই লোকটার মধ্যেও সেই ভাব আছে।

একটু ইতস্তত করে বাবু লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, 'ভাই, কী হয়েছে জানেন?'

লোকটা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকে আপাদমস্তক জরিপ করতে আরম্ভ করে।

'কী হয়েছে ভাই?... এত হইচই!'

বাবুর মনে হয় লোকটা এখন নিজে থেকেই সবকিছু বলবে।

'আমাদের দিকের কেউ হলে তো আমি চিনতাম। আপনি মেয়েপক্ষের, না?'

'জি।'

'কে হন?'

'জি, তেমন কেউ না। একটু চেনাজানা আছে।'

'কত দিন ধরে চেনেন এই ফ্যামেলিকে?'

'জি, চিনি...।'

'চেনেনই যখন, বলেন তো— একটা দু নম্বর মেয়েকে গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা এরা বা আপনারা কেন করলেন!'

'দু নম্বর মেয়ে!'

'পুরা দু নম্বর। মাস্তানরা নাকি দিনে-দুপুরে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর যা হওয়ার হয়েছে।'

'এসব কী আশ্চর্য কথা বলছেন!'

'অবাক হওয়ার ভান করবেন না, উঁহু, অবাক হওয়ার ভান করবেন না। এসব সবাই জানে। আমরাও জেনে গেছি। শুনলাম তার পর থেকে মাস্তানরা নাকি বাসায়ও যাওয়া-আসা করত।'

'ছি ছি, এসব কী বলছেন!'

'কী বলছি মানে! লোকজন যা বলছে, আমরা তা-ই বলছি।'

'লোকজন তো অনেক কিছুই বলতে পারে, সবই কি বিশ্বাস করতে হবে?'

'কিছু ঘটনা না থাকলে লোকজন তো আর এমনি এমনি বলে না।'

'এমনি এমনিও বলে... কোনো ঘটনাই নেই...।'

'আপনাকে এত অস্থির আর চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? বললেন সামান্য চেনাজানা, এখন ভাব দেখে মনে হচ্ছে...।'

ওই লোক আর কী বলে তা শোনার অপেক্ষায় থাকে না বাবু। সে দ্রুত সামনে এগিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে দেখে, পরিস্থিতি সত্যি গুরুতর। ছেলেপক্ষের মুরব্বিগোছের কয়েকজন এখনই বিয়ে বাতিল করে চলে যেতে চাইছেন। স্বাতীদের পক্ষের লোকজনকে খুবই অসহায় দেখাচ্ছে। তবে দুজন ব্যতিক্রম, স্বাতী আর স্বাতীর ভাই। স্বাতীর ভাই গলা চড়িয়ে সবাইকে বলছেন, জানাচ্ছেন, তার বোনকে তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তার বোনের স্বভাব-চরিত্র তার খুব ভালো করে জানা আছে, সুতরাং কোনো মিথ্যা অপবাদ তিনি মেনে নেবেন না। এ জন্যে যদি তার বোনের বিয়ে ভেঙে যায়, যাবে। তাদের পক্ষের মুরব্বিস্থানীয় কয়েকজন স্বাতীর ভাইকে ঠাণ্ডা করতে চাইছেন, বলছেন, বোঝাচ্ছেন— আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অবশ্যই একটা সমাধানে পৌঁছানো যাবে। তবে সে কথায় কান নেই স্বাতীর ভাইয়ের, তার একটাই বক্তব্য— তার বোন সম্পর্কে আগে ওই বাজে মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে, তারপর অন্য কথা। তার এই কথায়, বাবু বুঝতে পারে, ছেলেপক্ষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অসন্তোষ বাড়ছে।

বাবু স্বাতীর দিকে তাকায়। স্বাতী সাজানো মঞ্চের ওপর লাল শাড়ি পরে বসেছে। তাকে লাল পরির মতো লাগছে, মনে হচ্ছে ডানা মেলে এই এখনই উড়ে যেতে পারে সে। তবে তার চোখেমুখে বিষণ্নতার ছাপও লক্ষ করা যায়, বাবু বোঝে, নিশ্চয়ই অপমানিতও বোধ করছে। পাশের চেয়ারে বসেছে তার হবু স্বামী কামাল হাসান। সে মাথা নিচু করে আছে। ফলে তার অভিব্যক্তি কেমন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা না যাক, ছেলেটার ওপর খুব রাগ হয় বাবুর। এ কেমন ভালোবাসা তার ? স্বাতীকে জিজ্ঞেস করেই তো সে জেনে নিতে পারে তার জীবনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি ঘটেনি, তার বাসায় মাস্তানরা আসত কি আসত না। যদি এমন হয়, একটা দুর্ঘটনা ঘটেই গেছে স্বাতীর জীবনে, তবু প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে স্বাতীকে গ্রহণ করা উচিত এ ছেলের। তাহলেই বোঝা যাবে তার প্রেম গভীর ও প্রকৃত। কিন্তু ছেলেটাকে দেখাচ্ছে কাঠের পুতুলের মতো। যেন তার নিজের বিয়ে হলেও ব্যক্তিগত কোনো মতামত নেই, বক্তব্য নেই, যেন মুরব্বিরা যা বলবে তা-ই সে বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করবে। এমন একটা ছেলের সঙ্গে সংসারজীবনে কি স্বাতী সুখী হতে পারবে ?

তবে আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর জরুরি নয়। হঠাৎ করে বিয়েবাড়িতে কে ওই কথা রটাল, তা জানাও জরুরি নয়, জরুরি হচ্ছে এ সমস্যার সমাধান করা, জরুরি হচ্ছে সবাইকে শান্ত করে, বুঝিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানটা নির্বিঘ্নে পার করা। চারপাশ দেখে বাবুর মনে হয় পরিস্থিতি শান্ত করতে তাকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, এ ছাড়া আর উপায় নেই। বড় করে নিঃশ্বাস নেয় সে, তারপর জটলার দিকে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে ঠিক করে নেয় স্বাতীর ভাইকে সে বলবে— ভাই, আগে সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলি, বিয়ের দিন কোনো ঝামেলা... ।'

কিন্তু তাকে দেখেই স্বাতীর ভাই ভয়ঙ্কর খেপে যান। এতটাই খেপে যান, তিনি রীতিমতো তোতলাতে আরম্ভ করেন, 'তু-তু-তুমি...!'

'জি ভাই।' বাবু মৃদু গলায় বলে, 'একটু এদিকে শুনুন।'

'এদিকে শোনেন মানে কী ? এদিকে শোনার কথা কেন উঠছে ?' স্বাতীর ভাই বারুদের মতো ফেটে পড়েন, 'কে তুমি ? হু আর ইউ ?'

'জামান ভাই, আপনি যদি সবাইকে জানান দিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন...।'

'তো কী, তোমার সঙ্গে হুজুর হুজুর করে কথা বলতে হবে ? আমার বোনের নামে অহেতুক বদনাম দেবে আর আমি চুপ করে থাকব ?'

'অবশ্যই না। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই মিথ্যা অপবাদ থেকে স্বাতীকে মুক্ত করে আনা।'

'আবারও জিজ্ঞেস করছি, হু আর ইউ ? কে তুমি ? তোমার এত অন্তরঙ্গতা দেখানোর মানে কী ?' স্বাতীর ভাই কিছুক্ষণ বাবুর দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর রাগে ফেটে পড়েন, 'কীভাবে তুমি এখানে এসেছ, কে তোমাকে দাওয়াত করেছে!'

বাবু খুব সহজেই বলতে পারত স্বাতী তাকে দাওয়াত দিয়েছে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গ সে এড়িয়ে যায়, সে নিজেকে সহজ ও স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে খেয়াল করে, তার ও স্বাতীর বড় ভাইয়ের কথাবার্তা নিয়ে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে কানাঘুষা আরম্ভ হয়েছে। বাবু বুঝতে পারে পরিস্থিতি ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এভাবে আরো কিছুটা সময় গেলে, আরো কিছুটা বাদানুবাদ চললে, এই বিয়ের অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যেতে বাধ্য।

'জামান ভাই, আপনি ছেলেপক্ষের লোকজনকে জিজ্ঞেস করুন, এমন একটা উদ্ভট তথ্য তারা কোথায় পেলেন।' সে গলা তুলে বলে, 'কোনো একজনের নামে একটা অপবাদ তুললেই তো হলো না।'

এ কথায় কাজ হবে ভেবেছিল বাবু, কাজ হয়ও বটে, তবে ঠিক-কাজটা না হয়ে কাজ হয় উল্টো। বাবু খেয়াল করে স্বাতীর ভাই ক্রোধে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন। সম্ভবত একমাত্র বোনের বিয়েতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় তিনি বোধশূন্য হয়ে পড়েছেন, তার মাথা একেবারেই কাজ করছে না, তার যুক্তিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং এমনকি এই ভাবনাও তার মধ্যে তৈরি হতে পারে যে বাবুই বিয়ের অনুষ্ঠানে সঙ্গোপনে এ কথা ছড়িয়েছে।

বাবুর এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়, স্বাতীর ভাই তোতলাতে আরম্ভ করেন, 'কে-কে তো-তোমাকে দাওয়াত দিয়েছে ?'

'জি না, কেউ দেয়নি। আমি নিজেই এসেছি।'

'কেন এসেছ, স্বাতী সম্পর্কে এই মিথ্যা কথাগুলো ছড়াবার জন্যে ?'

'জামান ভাই, এসব আপনি কী বলছেন! স্বাতী আপা...।' বাবু থামে, 'আপা' শব্দটা সবার সামনে ইচ্ছে করেই ব্যবহার করে সে, তারপর অসহায়ের মতো বিয়ের আসরে সমাগত সবার দিকে তাকায় এবং বলে, 'স্বাতী আপা সম্পর্কে কথা রটাব আমি! এত দিনে আপনি আমাকে এই চিনলেন! আমি আপনার পায়ের কাছে বসে ছবি আঁকা শেখার চেষ্টা করেছি।'

স্বাতীর ভাই আবার মুখ খোলার আগেই বরপক্ষের মুরব্বিস্থানীয় একজন বাবুর পাশে এসে দাঁড়ান, 'কী ব্যাপার, আমাকে একটু খোলাখুলি বলো তো ভাই, শুনি।'

'ও কী বলবে, ও কী বলবে?' স্বাতীর ভাই চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও হচ্ছে নাটের গুরু।'

'প্লিজ জামান ভাই।' বাবু মরিয়া গলায় বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, দরকার হলে আপনি স্বাতী আপাকে জিজ্ঞেস করুন।... স্বাতী আপা, আপনাদের সাহায্য নিয়ে বড় হয়েছি, আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, আমি এসব কথা বলতে পারি?'

'স্বাতীকে সাক্ষী মানতে হবে না।' স্বাতীর ভাই চেঁচিয়ে ওঠেন।

'ব্যাপারটা কী, বলো তো ভাই।' বয়স্ক লোকটা তখন আবার জিজ্ঞেস করেন, 'যা শুনলাম তা যে আমরা বিশ্বাস করছি, তাও তো না। কিন্তু ব্যাপারটা তো আমাদের বুঝতে হবে।'

'এখানে বোঝার কিছু নেই।' বাবু কিছু বলার আগেই স্বাতীর ভাই বলেন, 'আপনি বয়স্ক মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এ রকম কানভাঙানি অনেকেই দেয়। আপনারা বিশ্বাস না করলে থাকেন, বিশ্বাস করলে চলে যান। আমার বোন একেবারে পানিতে পড়েনি।'

এ কথার পর দেখা যায় ছেলেপক্ষের অনেকেই চলে যাওয়ার জন্যে এক জায়গায় সমবেত হয়েছে।

এমনই বেগতিক অবস্থা, বাবু দেখে, তার মাথাও ঠিকমতো কাজ করছে না। সে কোনোমতে শুধু বলে, 'জামান ভাই, এসব কী বলছেন আপনি!'

'চুপ করো, তুমি চুপ করো বলছি। আর একটা কথাও বলেছ কি তোমাকে গুলি করে মারব।'

'কী করবেন?'

'গুলি করে মারব।' স্বাতীর ভাই চেঁচিয়ে ওঠেন। তার এই কথা হলরুমের সবাইকে প্রথমে বিমূঢ় করে দেয়, তার পরই গুঞ্জন ওঠে। বাবুও প্রথমে হতবাক হয়ে যায়। অতঃপর সে দ্রুত এগিয়ে উঠে যায় মঞ্চে। হলরুমের সবার দিকে ফিরে তাকিয়ে জোর গলায় বলে, 'আপনারা প্লিজ, আমাদের এদিককার কথা একটু শুনবেন?'

কথা শেষ করেই বাবু স্বাতীর দিকে তাকায়, 'স্বাতী আপা, আপনার কি বিশ্বাস হয়, আমি এসব উদ্ভট আর নোংরা কথা রটাতে পারি?'

স্বাতী চুপ থাকে।

'আপনাকে তো চুপ থাকলে হবে না। হ্যাঁ, আপনাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

স্বাতী একটুক্ষণ স্থির ও নিশ্চুপ থেকে সবেগে দুপাশে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ না, বাবু এসব কথা বলেনি।

বাবু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, সে তাকায় স্বাতীর পাশে বসা কামাল হাসানের দিকে, 'কামাল ভাই, অনেক দিন ধরে স্বাতী আপাকে আপনি চেনেন। আপনার কি কখনো মনে হয়েছে উনি এ রকম ? মানে... এই যে হঠাৎ করে আজেবাজে কথা শুনছেন স্বাতী আপাকে ঘিরে, আপনার কি মনে হয়, এর কোনো ভিত্তি আছে ?'

'আমি স্বাতীকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। সেই কবে থেকে আমাদের সম্পর্ক!' কামাল একটু ইতস্তত করে বলে, 'কিন্তু... কিন্তু আমি মাঝখানে বেশ কিছুদিন দেশে ছিলাম না।'

'ও, আর এর মধ্যে স্বাতী আপা খারাপ হয়ে গেল! আপনার ভালোবাসা এই বলে! যাকে সেই কবে থেকে ভালোবাসেন, দেশে ফিরে তার সম্পর্কে কিছু উটকো কথা শুনলেন, আর সেটাই সত্য বলে ধরে নিলেন! লজ্জা করছে না আপনার!'

পাশ থেকে স্বাতী মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বলে, 'বাবু, আপনি আমাকে ছোট করবেন না, আমি এই বিয়ে...।'

'শুনলেন, স্বাতী আপা কী বলতে চাইছেন।' বাবু স্বাতীর দিকে না তাকিয়ে কামালের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসে, 'পুরোটা বলেননি, তবে আমি নিশ্চিত উনি বলতে চাইছেন আপনার প্রতি ঘৃণা থেকে এই বিয়ে উনি করতে চাইছেন না। তা কামাল ভাই, এখনো কি আপনার একটুও লজ্জা হচ্ছে না ?'

বাবুর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে কামাল হাসান। বাবুর ভয় হয়, হঠাৎ কামাল হাসান হয়তো গর্জে উঠবে, 'কিসের লজ্জা, হ্যাঁ, কিসের লজ্জা! কিছু ঘটে না থাকলে এমনি এমনি কথা রটেছে ?' কিন্তু সে রকম কিছু ঘটে না, কামাল উঠে দাঁড়ায় বটে, তবে সে চেঁচিয়ে ওঠে না, সে শান্ত অথচ স্থির ও পরিষ্কার গলায় বলে, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমার লজ্জা হচ্ছে।' বলেই স্বাতীর দিকে তাকায় কামাল হাসান, 'স্বাতী, আমি ভুল করেছি, আমি মাফ চাইছি তোমার কাছে। মন থেকে মাফ চাইছি। মাফ করে দেবে না ?' স্বাতী কী উত্তর দেয় তার অপেক্ষায় থাকে না কামাল, সে হাত বাড়িয়ে স্বাতীর হাত ধরে, 'ওঠো।' তাকে টেনে তোলে, 'এই যে শুনুন সবাই' বলে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। হলভর্তি লোকজন তাদের দিকে ফিরে তাকায়। কামাল বলে, 'কী কথা কানে এল সেটা নিয়ে বসে থাকলে চলে না। কুৎসা রটনার লোক আমাদের সমাজে অসংখ্য। আমি স্বাতীকে ভালোবাসি, আমার ধারণা স্বাতীও আমাকে ভালোবাসে। আমাদের বিয়েটা হচ্ছে, এটাই শেষ কথা।'

হলভর্তি লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। তবে স্পষ্ট করে কারো কথাই বোঝা যায় না।

'বাবা...।' কামাল বলে, 'কাজিসাহেব ঝামেলা দেখে সরে পড়েছেন, তাকে আনানোর ব্যবস্থা করো।... দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা তো তোমার কাজ না। প্লিজ, কেউ একজন কাজিসাহেবকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।'

হলভর্তি লোকজনের ভেতর আবার গুঞ্জন ওঠে। তাদের অধিকাংশের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় কামালের কথা পছন্দ হয়নি। তবে হ্যাঁ, তার বাবা ঠিকই গুটি গুটি পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান।

বাবু স্বাতীর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি কাজিসাহেবের ব্যবস্থা করছি।'

'দাঁড়াও। সে-ব্যবস্থা আমিও করতে পারব। তার আগে অন্য কথা। এই যে এরা সবাই মিলে আমার বোনকে অপমান করল, তার কী হবে?'

'তার কিছুই হবে না। জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে জামান ভাই। সব ঘটনা ধরে রাখা ঠিক না, ধরে রাখলে চলে না। ছেলে আর ছেলের বাবা এই বিয়েতে সানন্দে রাজি। আমাদের আর কী দরকার!'

'দরকার আছে। এদের মাফ চাইতে হবে।'

বাবু অবাক হয়ে স্বাতীর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে! তার কোনো কথাই তো যুক্তিসঙ্গত শোনাচ্ছে না।

বাবু বলে, 'বাদ দেন তো!'

স্বাতীর ভাই বলে, 'না, আমি বাদ দেব না।'

'ঠিক আছে আপনি সরে দাঁড়ান। আমি ব্যবস্থা করছি।'

'এরা মাফ না চাওয়া পর্যন্ত তুমি কিছুই করবে না।'

'এদের বিয়েটা পড়িয়ে দেয়া এখন আমার দায়িত্বে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনি অন্যদিক দেখুন। আমি ছেলেপক্ষের কাউকে নিয়ে কাজি সাহেবকে আনতে যাই।'

'বাবু, আমার সঙ্গে পিস্তল আছে। তুমি এক পা নড়লে আমি তোমাকে গুলি করব।'

'কী!'

'তুমি এক পা নড়লে আমি তোমাকে গুলি করব। আমার সঙ্গে লাইসেন্স করা পিস্তল আছে।'

বাবু হেসে ফেলে, 'করুন দেখি গুলি।'

'বাড়াবাড়ি করলে সত্যি কিন্তু গুলি করব আমি বাবু, বিশ্বাস করো তুমি।'

'আহা, আমি তো আপনাকে গুলি করতেই বলছি।'

ঠিক তখনই শব্দটা শোনা যায়, সাপের মতো 'হিস' একটা শব্দ, তার পরই বাবুর শরীর টালমাটাল হয়ে ওঠে। সে নিজের শরীরের ভারসাম্য রক্ষার এমন চেষ্টা

করে, দেখে মনে হয় সদ্য হাঁটতে শেখা ছোট্ট একটা শিশু কিছুতেই পড়ে যাবে না, সে সামনে অপেক্ষমাণ মার কাছে পৌঁছবেই। কিন্তু তার সব চেষ্টাই বৃথা যায়। তার শরীর ক্রমশ নড়েচড়ে ওঠে, দুলে দুলে ওঠে, দুমড়ে-মুচড়ে যায়। তখন আরো একটা শব্দ হয়। বাবুর শরীর লাফিয়ে ওঠে অনেকটা। তার পরই সে হাত-পা মেলে মেঝেতে আছড়ে পড়ে। তার পিঠের ওপর রক্তজবার মতো একটা দাগ। সেখান থেকে লাল ঘন তরল বেরোচ্ছে দ্রুত, রক্তজবাটা বড় থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে, তার বুকেও সম্ভবত রক্তজবার ক্ষত। রক্ত আপন-মনে বেরিয়ে ঢালু জায়গার দিকে নির্বিকার এক ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গুলি খেয়েছে সে, সেটা বুঝে নিতে আশপাশের লোকজনের কোনো অসুবিধা হয় না, আর তাদের মুখ থেকে এই তথ্য সারা হলরুমে ছড়িয়ে পড়তেও সময় লাগে না। একটা হৈ-হুল্লোড় বাধে বটে, তবে নির্দিষ্ট করে কেউ কিছু বলে না। শুধু স্বাতীর ভাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেঁচিয়ে যান, 'আমি ? না না, আমি গুলি করিনি। আমি কী করে গুলি করব! আমার কাছে লাইসেন্স করা কেন, লাইসেন্স না-করা পিস্তলও নেই।'

ততক্ষণে স্বাতী আর কামাল ছুটে এসেছে বাবুর কাছে, বাবুর মুখে বেদনার এক হাসি, সে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি বলেছিলেন ওইখানে না যেতে, ওদের সঙ্গে না মিশতে, সবছেড়ে দিতে। এখন বুঝতে পারছেন তো...!'

'আপনি কথা বলবেন না, কথা বলবেন না প্লিজ।' কামাল তড়িঘড়ি করে বলে, 'ডাক্তার, ডাক্তার ডাকো কেউ। অ্যাম্বুলেন্স আসতে বলো।'

'ওসব কিছুই লাগবে না।' বাবু হাসার চেষ্টা করে, তার যাওয়ার সময় হয়েছে সে বুঝতে পারে, 'আমার যাওয়ার সময় হয়েছে।... কামাল ভাই...।'

'জি, জি ভাই।'

'আপনি কি একটা কথা জানেন, মৃত্যুপথযাত্রী কেউ মিথ্যে কথা বলে না ?'

'জানি ভাই, জানি। এটা সবাই জানে।'

'মৃত্যু আমার পাশে দাঁড়িয়ে। একটা কথা বলি, আমাকে যদি পৃথিবীর খুব ভালো একটা মেয়ের কথা বলতে বলা হয়, আমি ওনার কথা বলব।' বাবু স্বাতীর দিকে ইঙ্গিত করে কামালের দিকে ফেরে, 'আপনি জীবনে সুখী হবেন, সুখী হবেন।... দেখি, আপনার ডান হাতটা দিন।'

কামাল না-বুঝেই তার ডান হাতটা বাবুর দিকে এগিয়ে দেয়।

'এবার আপনার হাতটা দিন।' বাবু স্বাতীকে বলে, 'কত শখ ছিল আপনার হাতটা একটু ধরার, ছোঁয়ার,... কিন্তু সাহস হয়নি, ছুঁতে পারিনি।... আমি তো চলে যাচ্ছি, দিন না আপনার হাতটা!'

স্বাতীও হাত এগিয়ে দেয়। বাবু খুব কষ্টে দুজনের হাত এক মুঠোর মধ্যে নেয়, বিড়বিড় করে বলে, 'সুখী হবেন আপনারা, বিশ্বাস করেন, সুখী হবেন।'

Oikhane Jeo Nako Tumi by Pranob Bhatta

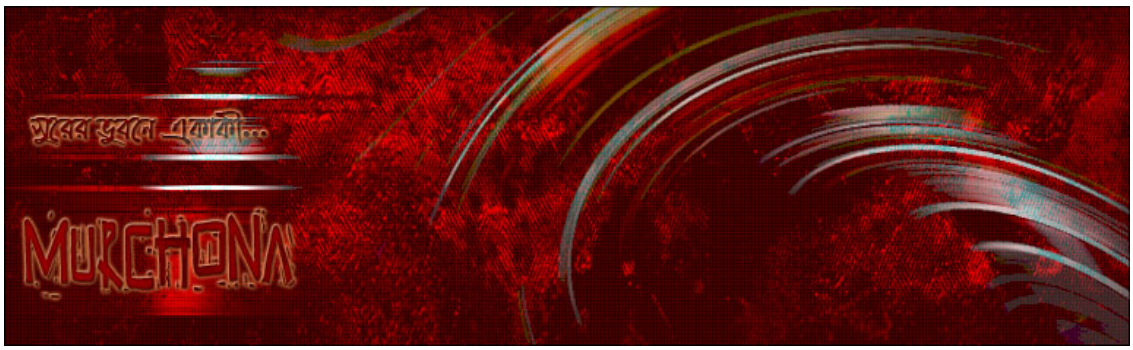

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com